প্রতিশিক্ষা

আমাদের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোর ভবিষ্যৎ প্রসঙ্গে

ফ্রিয়েদরিশ নিৎশে

অনুবাদ ও টীকা: বিপ্লব নায়ক

প্রাককথন

১৮৪৪ সালের ১৫ই অক্টোবর প্রুশিয়ার স্যাকসনি প্রদেশে লিপজিগের কাছে রোকেন গ্রামে ফ্রিয়েদরিশ নিৎশের জন্ম। তাঁর পাঁচ বছর বয়সও তখন পূর্ণ হয়নি, তাঁর বাবা, একজন লুথারিয় ধর্মযাজক, মারা যান। চোদ্দ বছর বয়সে প্ফর্টার বিখ্যাত বোর্ডিং স্কুলে তাঁকে ভর্তি করা হয়। ১৮৬৪ সালে কুড়ি বছর বয়সে স্কুলের পাঠশেষে স্নাতকোত্তর পাঠের জন্য প্রথমে বন বিশ্ববিদ্যালয়ে ধর্মতত্ত্ব (থিওলজি)-র ছাত্র হিসেবে ভর্তি হন, কিন্তু এক বছর পরেই বিষয় পরিবর্তন করে ধ্রুপদী ভাষাবিদ্যা (ক্লাসিকাল ফিলোলজি) অধ্যয়নের জন্য লিপজিগ বিশ্ববিদ্যালয়ে চলে আসেন। এই সময়েই তিনি সোপেনহাওয়ারের '*ইচ্ছা ও বিবরণ হিসেবে বিশ্ব*' নামক বইটির সংস্পর্শে আসেন এবং তা পড়তে শুরু করেন। ক্রমশ তিনি সোপেনহাওয়ার পাঠে নিমগ্ন হয়ে যান ও এই অভিজ্ঞতা তাঁর মধ্যে গভীর কিছু পরিবর্তনের সূচনা করে। ধর্মীয় নৈতিকতা, বিশেষ করে খ্রিস্টান নৈতিকতার আদ্যোপান্তকে সমালোচনার বিষয় করে তুলে তাঁর বোধ জন্মায় যে আধুনিক জীবন এক ধরনের শূন্যতাবাদ (নিহিলিজম)- য়ে আক্রান্ত। খ্রিস্টান ধর্মদৃষ্টি ও নৈতিকতায় সম্পূর্ণত আস্থা হারানোর পরও নতুন কোনও নৈতিকতার মূল্যবোধ গড়ে তোলার মতো সাংস্কৃতিক শক্তি না থাকাই এই শূন্যতাবাদের রূপে বিরাজ করছে বলে তাঁর মনে হয়। শিল্পী ও দার্শনিকের কর্তব্য এই সাংস্কৃতিক শক্তি প্রজননে পথিকৃৎ হয়ে 'জিনিয়াস'-য়ের ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করা। এহেন ভূমিকা পালনের জন্য দার্শনিকের জীবন কেমন হতে হবে? সোপেনহাওয়ারের জীবন অধ্যয়ন করে নিৎশে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছন যে সেই ভূমিকা পালনের জন্য দার্শনিককে রাষ্ট্র বা অন্য যে কোনো প্রতিষ্ঠান থেকে নিজেকে বিযুক্ত করে নিজস্ব স্বনির্ভর স্বাধীন যাপন কায়েম রাখতে হবে যাতে তাঁর বিশ্লেষণ ও সমালোচনা করার ক্ষমতা সজীব ও সুতীক্ষ্ণ থাকে (নিৎশের 'শিক্ষক হিসেবে সোপেনহাওয়ার' দ্রষ্টব্য)। ইতিমধ্যে নিৎশের বিশ্ববিদ্যালয়-পাঠ সম্পূর্ণ হয়েছে এবং তাঁর প্রখ্যাত শিক্ষকের জোরালো সুপারিশের জোরে ১৮৬৯ সালের বাসেল বিশ্ববিদ্যালয়ে ধ্রুপদী ভাষাবিদ্যার সহকারী অধ্যাপক হিসেবে তিনি নিযুক্ত হলেন। এক বছরের মধ্যেই তিনি পূর্ণ অধ্যাপক পদে উন্নীত হন। কিন্তু নিৎশে ক্রমশ বিশ্ববিদ্যালয় সহ গোটা শিক্ষাব্যবস্থা সম্পর্কে আরো বেশি বেশি

সমালোচনাত্মক হয়ে উঠছিলেন। দার্শনিকের কাম্য ভূমিকা সম্পর্কে যে ধারণায় তিনি পৌঁছেছিলেন, তার তুলনায় বিদ্যায়তনের প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর মধ্যে প্রথাগত বাঁধাধরা বিদ্যাচর্চা তাঁর কাছে অত্যন্ত বন্ধ্যা ও প্রাণহীন মনে হচ্ছিল। ধ্রুপদী ভাষাবিদ্যার গণ্ডীর বাইরে বেরিয়ে সমালোচনাত্মক দর্শনের মুক্ত অঙ্গনে প্রবেশ করার আকুতিও তাঁর মধ্যে প্রবল হয়ে উঠেছিল। প্লেটো-পূর্ববর্তী যুগের গ্রিক দার্শনিকদের চিন্তা ও যাপন নিয়ে তাঁর গবেষণার মধ্য দিয়েও তিনি নিজেকে নতুন ভূমিকার জন্য প্রস্তুত করছিলেন। এইরকম একটি মুহূর্তে তিনি বাসেলের সিটি মিউজিয়মে শিক্ষাব্যবস্থা সম্পর্কে সর্বজনীন ভাষণ দিতে আমন্ত্রিত হন। ১৮৭২ সালের ১৬ই জানুয়ারি থেকে ২৩ শে মার্চের মধ্যে পাঁচ দফায় সদ্য সাতাশ কছর পেরোনো নিৎশে এই ভাষণ দেন। শ্রোতা সমাগম হয়েছিল ভালোই। এই ভাষণে নিৎশে শিক্ষা ও জ্ঞানচর্চা ব্যবস্থা সম্পর্কে তাঁর সার্বিক সমালোচনাকে নাটকীয় ভাবে হাজির করেন। ভাষণটি ছেপে বের করার পরিকল্পনাও তাঁর ছিল, সেইজন্য একটি ভূমিকা ও মুখবন্ধও তিনি পরে লিখেছিলেন, শিরোনাম দিয়েছিলেন : '*আমাদের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোর ভবিষ্যৎ প্রসঙ্গে*'। নিৎশের জীবৎকালে অবশ্য এটি প্রকাশ পায়নি। ২০১৬ সালে ড্যামিয়ন সাস মূল জার্মানি থেকে এর ইংরেজি অনুবাদ করেন এবং নিউ ইয়র্ক রিভিউ-য়ের পক্ষ থেকে '*অ্যান্টি-এডুকেশন*' শিরোনামে তা প্রকাশিত হয়। এই ইংরেজি অনুবাদ থেকে নির্বাচিত অংশ আমরা এখানে বাংলা অনুবাদে হজির করেছি।

প্রায় দেড়শ বছর আগের একটি ভাষণকে বাংলা অনুবাদে হাজির করার তাগিদ আমরা বোধ করলাম কেন? তাগিদ বোধ করলাম আমাদের সমসাময়িক শিক্ষা ও জ্ঞানচর্চা ব্যবস্থা সম্পর্কে সার্বিক সমালোচনা ও বিকল্প চিন্তার প্রয়োজনীয়তাবোধ থেকে। সর্বজনীন করার নামে শিক্ষার ধ্বংসাত্মক তরলীকরণ, মাতৃভাষার প্রতি নিদারুণ উপেক্ষা, ঐতিহ্যের উপর দখলদারি কায়েমের আড়ালে ঐতিহ্যের ধ্বংসসাধন, রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণক্ষমতার ক্রমবৃদ্ধি— শিক্ষা ও জ্ঞানচর্চার জগতে আমাদের সময়ের এই বৈশিষ্ট্যগুলোর আপদ সম্পর্কে নতুন ভাবনার চৌকাঠে এই নিৎশে-পাঠ হয়ত আমাদের পৌঁছে দিতে পারে।

বিপ্লব নায়ক

ডিসেম্বর, ২০২২

ভূমিকা

... এখানে, আলোচনায় ঢোকার এই প্রবেশদ্বারে, প্রথমেই বলে দেওয়া যাক যে কোন সাধারণ পরিপ্রেক্ষিত থেকে আমি আমাদের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোকে বিচার করতে চলেছি। প্রবেশদ্বারেই পরিচয়ফলকের মতো আমার উপপাদ্যের একটি সুস্পষ্ট সংক্ষিপ্তসার ঝুলিয়ে দেওয়া ভালো যাতে প্রবেশকারী যে কোনও ব্যক্তি তা দেখে বুঝে নিতে পারেন কার গৃহের অন্দরে তিনি প্রবেশ করতে চলেছেন আর যাতে এই পরিচয়ফলক খুঁটিয়ে দেখার পর চাইলে তিনি আর প্রবেশ না করে মুখ ঘুরিয়ে চলেও যেতে পারেন।

আমার উপপাদ্যটি হল:

শুরুতে সম্পূর্ণ ভিন্ন ভিত্তির উপর নির্মিত হলেও আমাদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোয় বর্তমানে এমন দুটি প্রবণতা আধিপত্য বিস্তার করেছে যে দুটি আপাতদৃষ্টিতে পরস্পরবিরোধী হলেও যাদের প্রভাব একইরকমভাবে ধ্বংসাত্মক এবং শেষাবধি তারা একই পরিণতির দিকে নিয়ে যায়। এই দুইয়ের মধ্যে একটি হল শিক্ষাকে যথাসম্ভব বিস্তৃত করা, আর দ্বিতীয়টি হল শিক্ষাকে সংকীর্ণ করে তুলে দুর্বল করা। প্রথম প্রবণতাটি শিক্ষা ও সংস্কৃতিকে ক্রমশ আরও বিস্তীর্ণ পরিধির মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য ঠেলে; আর দ্বিতীয় প্রবণতাটি চায় যাতে শিক্ষা তার স্বশাসনের সর্বোচ্চ দাবিটি ত্যাগ করে জীবনের এক অপর আকার অর্থাৎ রাষ্ট্রের সেবায় নিজেকে সমর্পণ করে। অতিরিক্ত ফাঁপিয়ে তোলা ও দুর্বল করে তোলার এই দুই বিপর্যয়কারী প্রবণতাদ্বয়ের মুখে নৈরাশ্যে ডুবে যাওয়াই অবশ্যম্ভাবী হতো যদি না এদের বিরোধী দুটি বলকে শক্তি যুগিয়ে শেষাবধি বিজয়ের পথে যেতে সাহায্য করার সম্ভাবনা থাকত। আগাপাশতলা জার্মান ও উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ সম্ভাবনাধারী এই দুটি বিরোধী বল হল: শিক্ষার ক্রমপ্রসারমান বিস্তৃতির বিপরীতে কাজ করে শিক্ষাকে সংকুচিত ও ঘনীভূত করার চেষ্টা, আর, শিক্ষাকে দুর্বল করার বিপরীতে কাজ করে শিক্ষাকে শক্তিশালী ও স্বয়ংসম্পূর্ণ করে তোলার চেষ্টা। আমাদের জয়ী হওয়ার আত্মবিশ্বাসের কারণ কী? আত্মবিশ্বাসের কারণ হল এই জ্ঞান যে ফাঁপিয়ে তোলা ও দুর্বল করার প্রথম দুটো প্রবণতা প্রকৃতির চিরায়ত অপরিবর্তনীয় অভিপ্রায়ের বিরুদ্ধে কাজ করছে এবং কেবলমাত্র একটি মিথ্যার সংস্কৃতিই সৃষ্টি করতে পারে, যেখানে গুটিকয়ের মধ্যে শিক্ষাকে ঘনীভূত করা হল প্রকৃতির একটি আবশ্যিক নিয়ম।

মুখবন্ধ

মূল আলোচনার সঙ্গে প্রসঙ্গ-নিরপেক্ষ হলেও
মূল আলোচনা পড়তে শুরু করার আগে এটি পড়া বঞ্ছনীয়

যে পাঠকের আমি আশা করি, তার তিনটি গুণ থাকতে হবে: সে কোনও তাড়াহুড়ো না করে প্রশান্তচিত্তে পড়বে; তার পঠনপ্রক্রিয়ায় সে সর্বদাই নিজেকে ও নিজের 'সংস্কৃতি'-কে অনাহূতভাবে হস্তক্ষেপ করতে দেবে; আর শেষত, তার কোনও মূর্ত ফললাভের আশা থাকবে না, আলোচনাশেষে কিছু সারণি ও নকশার পথ চেয়ে সে পড়বে না। জিমনাসিয়াম বা রিয়ালস্কুলের জন্য কোনও পরিমার্জিত সময়সারণি বা নতুন নকশা আমার দেওয়ার নেই। প্রায়োগিক খুঁটিনাটির তলদেশ থেকে প্রকৃত সাংস্কৃতিক সমস্যার উচ্চ শিখর অবধি গোটা পথটি পরিক্রমা করে যারা আবার বিধিনিয়মের ঊষরতম নিচুজমিতে নেমে এসে খুঁটিনাটিসমেত নকশা তৈরি করতে পারেন, তাঁদের গগনচুম্বী উদ্যম দেখে আমি বিস্ময়াবিষ্ট না হয়ে পারি না। আমার নিজের ক্ষেত্রে আমি তুলনায় উঁচু কোনো শিখরে হাত-পা লাগিয়ে কোনওক্রমে বেয়ে উঠে হাপরের মতো শ্বাস টানতে টানতে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে বিস্তীর্ণ দিকচক্রকে চোখের সামনে উন্মুক্ত হয়ে যেতে দেখেই সন্তুষ্ট। এই বর্তমান আলোচনা কখনোই নকশাপিপাসুদের সন্তুষ্টিবিধান করতে পারবে না।

ভবিষ্যতে এমন একটা সময়কে আমি কল্পনা করতে পারি যখন পুনর্নবীকৃত ও বিশোধিত সাংস্কৃতিক শিক্ষার সেবায় নিয়োজিত আন্তরিক মানুষজন আবারও সেই নতুন শিক্ষার পথ তৈরি করতে দৈনন্দিন নির্দেশনা হাজির করার জন্য যৌথভাবে নীতিপ্রণয়ন করবে। তখন তারাও হয়ত সারণি ও নকশা তৈরি করবে। কিন্তু কত না সুদূর সেই দিন! তার আগে কত না কিছু ঘটে যেতে হবে! আজ থেকে সেইদিনে যাওয়ার পথে হয়ত জিমনাসিয়াম ধ্বংস হয়ে যেতে পারে, হয়ত বিশ্ববিদ্যালয়ও ধ্বংস হয়ে যেতে পারে, নতুবা অন্তত এহেন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোর কাঠামো এতটাই পুনর্গঠিত হয়ে যাবে যে তাদের পুরানো সারণি ও নকশাগুলোকে তাম্রযুগের ধ্বংসাবশেষ বলে মনে হবে।

এই বইটি সেই প্রশান্ত পাঠকদের জন্য যারা এখনও আমাদের এই হেঁচড়ে টেনে নিয়ে চলা যুগের হতবুদ্ধিকর তাড়াহুড়োর পাকে বাঁধা পড়েনি এবং তার চাকার তলায় পিষ্ট হওয়ার মধ্যে এক ভক্তিভাবাশ্রিত আনন্দ-উত্তেজনা বোধ করে না— অর্থাৎ, এই বই খুব গুটিকয় পাঠকের জন্য। কতটা সময় বাঁচানো

গেল বা কতটা সময় নষ্ট হল তার ভিত্তিতেই সবকিছুর বিচার এই গুটিকয় পাঠক করে না: তাদের 'হাতে এখনও সময় আছে'। তারা এখনও সর্বোত্তম প্রহরগুলো, অর্থাৎ, দিনের সবচেয়ে উর্বর ও সবচেয়ে প্রগাঢ় মুহূর্তগুলো বেছে নিয়ে জড়ো করে আমাদের সংস্কৃতির ভবিষ্যৎ নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা করে। তার জন্য তারা সময় অপচয়ের আত্মধিক্কারে আক্রান্ত হয় না, বরঞ্চ প্রকৃত ফলদায়ক ও যথোপযুক্ত ভাবে সময় অতিবাহিত করা হয়েছে বলে সন্তুষ্টিলাভ করে। এমন যে জন সে এখনও চিন্তা করতে ভুলে যায়নি। পড়তে পড়তে সে এখনও দুই লাইনের মধ্যে পড়ার গোপন কলাটিকে বোঝে। সে এতটাই অকাজের মানুষ যে কোনও কিছু পড়ার পর দীর্ঘক্ষণ সে তা নিয়ে ভাবে, বই পড়া শেষ হয়ে যাওয়ার বহু পর অবধিও তা নিয়ে তার চিন্তাভাবনা চলতে থাকে। আর সেই চিন্তাভাবনা কোনও একটি পুস্তক-পর্যালোচনা লেখার জন্য নয়, বা আরেকটা কোনো বই লেখার জন্যও নয়, নিতান্তই অহৈতুকী সেই চিন্তাচর্চা। এতই অপচয়মনস্ক সে যা নির্ঘাৎ অপরাধ বলে চিহ্নিত হবে! সে এতটাই প্রশান্ত ও নিরুদ্বেগ যে লেখকের হাত ধরে সে এমন এক দীর্ঘ রাস্তায় পাড়ি জমাতে পারে যার শেষ হয়ত অনেক পরের কোনো প্রজন্মই দেখতে পাবে। বিপরীতে যখন কোনও তীব্র বিক্ষুব্ধ পাঠক কাজের তাড়ায় দীর্ঘ দশকের পর দশক বা শতকের পর শতক জুড়ে কঠিন প্রয়াসের মধ্য দিয়ে লভ্য ফলকে এক তুড়িতে এখনই পেড়ে আনতে চায়, তখন আমাদের এই আশঙ্কাই করা উচিত যে সে লেখককে বুঝতে ব্যর্থ হয়েছে।

শেষত, তৃতীয় এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দরকারী বিষয় হল: কোনও পরিস্থিতিতেই যেন পাঠক নিজেকে বা নিজের সাংস্কৃতিক অর্জনকে অনবরত সমস্ত বস্তুর মাপকাঠি ও বিচারনীতি হিসেবে না ধরে নেয়, যে প্রবণতা আধুনিক মানুষের মধ্যে খুবই প্রবল। পাঠক নিজের শিক্ষাকে অবজ্ঞাভরে ছোট করে দেখার মতো যথেষ্ট শিক্ষিত হোক, তবেই সে নির্দ্বিধায় এমন এক লেখকের দেওয়া দিকনির্দেশ ধরে এগোতে পারবে যে লেখক কিনা অজ্ঞানতার অবস্থান থেকে অর্থাৎ নিজে যে জানে না তা জানার পরিপ্রেক্ষিত থেকে পাঠককে সম্বোধন করছে। আমাদের সমসাময়িক জার্মান বর্বরতার বৈশিষ্ট্য, অর্থাৎ, কোথায় আমরা এই উনিশ শতকের বর্বররা লক্ষ্যণীয়ভাবে অতীতের বর্বরদের থেকে আলাদা, তা সম্বন্ধে এক জ্বালাধরা অনুভূতি ছাড়া আর কিছুরই অধিকারী হওয়ার দাবি বর্তমান লেখকের নেই।...

মূল আলোচনা

...শুনতে পেলাম যে দার্শনিকের তরুণ সঙ্গীটি বেশ উত্তেজিতভাবে আত্মরক্ষা করে যাচ্ছে, আর দার্শনিক ক্রমশ আরও বজ্রনাদী হয়ে উঠতে থাকা স্বরে তাকে আক্রমণ করছে। দার্শনিক মহাশয় চিৎকার করে বলছিলেন, "তুমি একটুও বদলাওনি, হায়! তোমার কোনও বদল হয়নি। সাত বছর আগে শেষবার যখন আমি তোমায় দেখেছিলাম, যখন দ্বিধাদ্বন্দ্বভরা আশা নিয়ে নিজের পথ তৈরি করে নেওয়ার যাত্রায় তোমায় পাঠিয়েছিলাম, তখনকার তুমি আর এখনকার তুমি-র মধ্যে এত ক্ষীণ পার্থক্য আমি বিশ্বাসই করতে পারছি না। আবারও সেই অপ্রিয় কাজটিই আমায় করতে হচ্ছে— তোমার উপর শিক্ষার যে আধুনিক পাতলা মোড়কটি পড়েছে, তা চেঁছে তুলতে হচ্ছে— আর তার নীচে আমি এ কী দেখতে পাচ্ছি? কান্টের ভাষায় বললে, সেই একই অপরিবর্তিত 'বোধগম্য' চরিত্র, কিন্তু দুর্ভাগ্যজনকভাবে যা এক পরিবর্তনহীন বৌদ্ধিক চরিত্র, যার এই অপরিবর্তনশীলতা হয়ত যৎপরনাই প্রয়োজনীয় বলেও কোনও সান্ত্বনা তৈরি করতে পারে না।[১] তোমার মতো বুদ্ধিমান ও শেখার জন্য সত্যিই আগ্রহী একজন এতগুলো বছর আমার সঙ্গে অতিবাহিত করার পরও যদি তার কোনও ছাপ প্রকৃত অর্থে তার উপর দেখা না যায়,তাহলে আর আমার দার্শনিক হিসেবে এই জীবনটাকে ব্যয় করে দেওয়ার সার্থকতা কোথায়! তোমার সঙ্গে আমার প্রথম দিকের আলোচনাগুলোয় আমি বারংবার ফিরে ফিরে শিক্ষার মৌলিক নীতি নিয়ে যে কথাগুলো বলেছিলাম, তোমার কাজকর্ম দেখে মনে হচ্ছে যেনবা কোনওদিন সেসব তোমার কর্ণগোচরই হয়নি। তোমার কি সেইসব কথাগুলো মনে আছে?"

ভর্ৎসিত ছাত্রটি বলল, "আমার মনে আছে। আপনি সবসময় বলতেন শিক্ষা অর্জনের জন্য কেউ দরেকষে চেষ্টা করত না যদি তারা জানত যে কত না গুটিকয়জনই মাত্র প্রকৃত শিক্ষিত মানুষ আছে এবং কখনও এরচেয়ে বেশি হতেও পারেনা। কিন্তু আপনি এটাও বলতেন যে প্রকৃত শিক্ষিতদের এই ক্ষুদ্র ভগ্নাংশও অর্জন করা অসম্ভব হতো যদি না বিপুল সংখ্যক মানুষকে কৌশল খাটিয়ে প্রলুব্ধ করে তাদের স্বপ্রকৃতির বিরুদ্ধে নিয়ে এসে একপ্রকার শিক্ষার পশ্চাদ্ধাবন করায় নিয়োজিত করা যেত। সেই জন্যই প্রকৃত শিক্ষিত মানুষদের অতি ক্ষুদ্র সংখ্যাএবং আমাদের বেঢপ অতিবৃদ্ধিপ্রাপ্ত শিক্ষাব্যবস্থার বিপুল আকারের মধ্যেকার হাস্যকর বিষমতার বিষয়টা কখনই আমাদের সর্বজনসমক্ষে ফাঁস করে দেওয়া উচিত নয়। আপনি বলতেন যে শিক্ষার আসল রহস্যটা

এখানেই: অগণিত মানুষ তার জন্য লড়াই করে মরে, ভাবে যে তারা নিজেদের জন্যই লড়াই করছে, কিন্তু আসলে তারা খুব ক্ষুদ্র একটি অংশের জন্য শিক্ষাকে সম্ভবপর করে তোলার জন্যই কেবল লড়ছে।"

দার্শনিক বললেন, "ঠিক কথা। অথচ তুমি সে কথা এতটাই ভুলে বসেছিলে যে তুমি ভাবতে শুরু করেছিলে তুমি নিজে সেই অতি কতিপয় প্রকৃত শিক্ষিতদের একজন? তুমি যে এমনটাই ভাবতে শুরু করেছিলে তা আমি বলে দিতে পারি। আমাদের এই শিক্ষিত সময়ের ফালতু চরিত্রের বৈশিষ্ট্যটাই হল এমন। লোকে জিনিয়াসদের অধিকারের গণতান্ত্রিকীকরণ ঘটিয়ে দিয়েছে যাতে সংস্কৃতিচর্চার প্রকৃত কাজকে এড়িয়ে যাওয়া যায় আর এড়িয়ে যাওয়া যায় শিক্ষার চাহিদাকেও। জিনিয়াসরা যে বৃক্ষ রোপণ করে গেছেন তার ছায়াতলে আয়েস করতে কে না চায়, কিন্তু সেই জিনিয়াসদের জন্য বা সেই জিনিয়াসদের সম্ভবপর করে তোলার জন্য পরিশ্রমের রূঢ় প্রয়োজনীয়তাকে সবাই এড়িয়ে যেতে চায়। তুমি কি বলছ যে একজন শিক্ষক হওয়ার পক্ষে তুমি যথেষ্ট আত্মাভিমানী? তোমার চারদিকে ভিড় করে থাকা শিক্ষার্থীদলকে কি তুমি ঘৃণা কর? তুমি শিক্ষকের কাজকে হেয় করছ? আর তারপর রাগ দেখিয়ে সাধারণের ভিড়ের উল্টোদিকে নিজ অবস্থান সংজ্ঞাত করে তুমি আমাকে ও আমার যাপনকে অনুকরণ করে এক নিঃসঙ্গ একাকী জীবন যাপন করতে চাইছ? দার্শনিক হিসাবে বাঁচার জন্য এক অতি দীর্ঘ একগুঁয়ে সংগ্রামের পরই কেবল যা আমি অর্জন করতে পেরেছি, তুমি ভাবছ যে একলাফেই তুমি সেখানে পৌঁছে যাবে? আর তুমি একটুও ভয় পাচ্ছ না যে এই নিঃসঙ্গতা-একাকীত্ব তোমার উপর কী প্রতিশোধ তুলবে? সংস্কৃতিচর্চার ঋষিসাধক হওয়ার চেষ্টা করে দেখ— শুধু চেষ্টাই— সকলের জন্য বাঁচতে, একা নিজের বাইরে বেরিয়ে বাঁচতে, কত না সম্পদ জরুরী বুঝবে! তোমরা সব আশ্চর্য তরুণ! সবসময় তোমরা ভাবো যে সেটাই তোমাদের অনুকরণ করতে হবে যা সবচেয়ে কঠিন ও সবার উপরে, যা কেবলমাত্র একজন ওস্তাদই করতে পারে। অথচ তোমাদেরই সবচেয়ে বেশি করে জানা উচিত যে এমন প্রয়াস কত না কঠিন ও বিপজ্জনক, কত না চমৎকার মেধা এভাবে নিজের ধ্বংস ডেকে আনতে পারে!"

জবাবে তাঁর তরুণ সঙ্গী বলল, "গুরু, আমি আপনার কাছে কিছুই গোপন রাখতে চাই না। আপনার কাছ থেকে আমি যা শুনেছি এবং আপনার সাক্ষাৎ উপস্থিতিতে আমি যে সময় কাটিয়েছি, তারপর আমাদের এই বর্তমান শিক্ষণ-অধ্যাপনার ব্যবস্থায় নিজের দেহ-মন সঁপে দেওয়া আমার পক্ষে সম্ভব হচ্ছে না।

আমার সামনে অতি স্পষ্টভাবে এই ব্যবস্থার হতাশাকর ভ্রান্তি ও খামতিগুলো ফুটে উঠছে, যেগুলো আপনি প্রায়শই চোখে আঙুল দিয়ে দেখাতেন। অথচ নির্ভীক সংগ্রামের মধ্য দিয়ে একে পরাহত করার জন্য যতটা শক্তি দরকার তা আমি নিজের মধ্যে খুঁজে পাই না। ফলে আমি হতোদ্যম হয়ে পড়ি। নিঃসঙ্গতা-একাকীত্বের মধ্যে আমার পশ্চাদ্ধাবন কোনও ঔদ্ধত্য বা দম্ভের ফল নয়।

"আজকের দিনের শিক্ষণ-অধ্যপনার জরুরী ও অত্যাবশ্যক প্রশ্নগুলোর চরিত্র সম্পর্কে আমার যা মনে হয়, তা আপনাকে বলি। আমার মনে হয় যে আমাদের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোয় বলবৎ দুটি আধিপত্যকারী প্রবণতাকে আমাদের পৃথক করে চিহ্নিত করা উচিত। এই প্রবণতাদুটি আপাতভাবে পরস্পরবিরোধী, যদিও তারা সমভাবেই ক্ষতিকর এবং অন্তিম ফলের বিচারে শেষাবধি পরস্পর-অভিসারী। প্রথম প্রবণতাটি হল শিক্ষার বিস্তার ও ব্যাপ্তিকে সর্বোচ্চ সম্ভাব্য জায়গায় নিয়ে যাওয়ার প্রয়াস। আর দ্বিতীয় প্রবণতাটি হল শিক্ষাকে দুর্বল ও সংকীর্ণ করে তোলার প্রয়াস। প্রথম প্রবণতার দাবি হলো যে বিবিধ কারণে শিক্ষাকে ব্যাপ্ততম বৃত্তের পরিধি অবধি পৌঁছতে হবে। আর তখনই দ্বিতীয় প্রবণতা প্রত্যাশী যে শিক্ষা তার সর্বোচ্চ, সবচেয়ে মহানুভব ও সর্বোন্নত স্বত্বগুলোকে পরিত্যাগ করে রাষ্ট্রের মতো অপর কোনও জীবনাকারকে সেবা করার মধ্যেই নিজেকে সন্তুষ্ট রাখবে।[২]

"শিক্ষার সর্বোচ্চ সম্প্রসারণের জন্য সবচেয়ে উচ্চকিত ও সবচেয়ে স্পষ্ট আহ্বান কোথা থেকে আসছে তা আমি জানি মনে হয়। সম্প্রসারণ হল আজকের দিনের সবচেয়ে সমাদৃত জাতীয়-অর্থনৈতিক মতবাদগুলোর মধ্যে অন্যতম।[৩] সর্বত্র আওড়ানো ব্যবস্থাপত্রটি হল এইরকম: যথাসম্ভব আরো বেশি জ্ঞান ও শিক্ষা— তার হাত ধরে যথাসম্ভব সর্বোচ্চ উৎপাদন ও চাহিদা— আর তার হাত ধরে সর্বোচ্চ সুখভোগ। শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হিসেবে তুলে ধরা হয় 'উপযোগিতা'-কে, বা আরো নির্দিষ্ট করে বললে, 'লাভ'-কে, অর্থাৎ, সর্বোচ্চ সম্ভব উপার্জনের সম্ভাবনাকে। এই দৃষ্টিভঙ্গি থেকে দেখলে, শিক্ষার সারবত্তা হল সর্বদা 'আপ টু ডেট' থাকার বিচক্ষণতা আয়ত্ত করানো, সবচেয়ে সহজে ধনী হওয়ার সবরকম উপায় রপ্ত করানো, আর মানুষজন তাদের বিষয়আশয়ের কজকর্ম চালায় যে সমস্ত প্রণালীর মাধ্যমে সেসবের উপর ক্ষমতা ফলানোর জায়গা করে দেওয়া। ফরাসিরা বলে থাকে 'au courant', যেভাবে একটা মুদ্রা বৈধ ও চালু থাকে তেমনই বাজারে সবসময় চালু থাকতে পারে এমন মানুষ তৈরি করাই এই দৃষ্টিভঙ্গিমতে শিক্ষার প্রকৃত কর্তব্য। বাজারে যত বেশি সংখ্যায় এই

চালু লোকেদের সংবহন চলবে, জাতি ততই সার্বিকভাবে সুখসমৃদ্ধ হয়ে উঠবে। আর এটাই হয়ে দঁড়িয়েছে আধুনিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোর লক্ষ্য: জনৈকের প্রকৃতিতে যতটা সয় ততটাই তাকে 'প্রচল' করে তোলা, এমনভাবে প্রশিক্ষিত করা যাতে কেউ তার নিজের মধ্যের জ্ঞান-বুদ্ধির জন্য সহজাত সামর্থ্যকে (তা যাই হোক না কেন) সর্বোচ্চসম্ভব উপার্জন ও সুখভোগে রূপান্তরিত করতে পারে। প্রত্যেককে নিজের সম্বন্ধে একটা যথাযথ খতিয়ান হাজির করার ব্যাপারে দড় হতে হবে, জীবনের কাছ থেকে ঠিক কতটা দাবি করা তার অধিকার তা নির্ধারণ করে নিতে হবে। এই দৃষ্টিভঙ্গিতে 'বুদ্ধিমত্তা ও বিষয়সম্পত্তির মধ্যে যে যোগাযোগকে' হাজির করা হয়, তা কার্যত একটি নৈতিক দাবি। এই দৃষ্টিভঙ্গিধারীরা সেইরকম যেকোনো শিক্ষাকে ঘৃণা করে যে শিক্ষা ব্যক্তিকে তার স্বতন্ত্র স্বকীয় পথে নিয়ে যায় বা অর্থ উপার্জনের বাইরে উচ্চতর কোনও লক্ষ্যকে হাজির করে বা অনেক দীর্ঘ সময় নেয়। এমনকি তারা এই ভিন্নতর শিক্ষাভাবনাগুলোকে 'উচ্চতর আত্মঅহমিকা' বা 'অনৈতিক শিক্ষাগত আত্মসুখসর্বস্বতা' বলে বিদ্রূপ করে নস্যাৎ করতে চায়। এই ব্যবস্থাগত নৈতিক সংহিতা আসলে ঠিক বিপরীতটাই দাবি করে, তা দাবি করে যে একদিকে শিক্ষাপ্রক্রিয়া হবে অতি দ্রুত যাতে তাড়াতাড়ি টাকা রোজগার শুরু করে দেওয়া যায়, আর একইসঙ্গে অন্যদিকে শিক্ষা হবে ততটাই বিশদ যাতে কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা রোজগার করা যায়। ততটাই সংস্কৃতিকে রেয়াত করা হয় যতটা টাকা রোজগারের ধান্দায় কাজে দেয়, আর সেই পরিমাণ সংস্কৃতি দাবিও করা হয়। সংক্ষেপে বললে: জাগতিক সুখভোগের উপর মানুষের একটি আবশ্যিক অধিকার আছে আর তার জন্যই শিক্ষার প্রয়োজন এবং কেবলমাত্র এই একটি কারণেই প্রয়োজন!"

দার্শনিক বললেন, "এখানে আমি কিছু বলতে চাই। এই যে প্রেক্ষাপটটি তুমি সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করলে তা এক বিরাট ও ভয়ানক বিপদ ডেকে আনছে। সে বিপদ হল এই যে কোনও না কোনও সময়ে জনসাধারণ মধ্যবর্তী সব ধাপ লাফিয়ে পেরিয়ে সরাসরি জাগতিক সুখভোগের পশ্চাদ্ধাবন করবে। একেই আজ মানুষ 'সামাজিক প্রশ্ন' নাম দিয়েছে। অন্যভাবে বললে, জনসাধারণের সামনে হয়ত এটাই প্রতিভাত হবে যে সর্বোচ্চ সংখ্যক লোকের জন্য শিক্ষা আসলে গুটিকয়ের জাগতিক সুখভোগের উপায় ছাড়া আর কিছু নয়। 'সার্বজনীন শিক্ষা'-র জন্য প্রয়াস শিক্ষাকে এতই লঘু করে দেয় যে তা আর কোনও সুবিধা এনে দিতে পারে না, কোনও মর্যাদার যোগ্যও থাকে না। বর্বরতাই

হল সবচেয়ে সার্বজনীন শিক্ষা, তাই নয় কি? কিন্তু আমি তোমার কথায় আর বাধা দিতে চাই না।”

দার্শনিকের সঙ্গী আবার বলতে শুরু করল: “এই অতি-সমাদৃত জাতীয়-অর্থনৈতিক মতবাদ ছাড়াও আরও বেশ কিছু কারণে আমরা এত বিপুল সংখ্যক মানুষজনকে এত বেপরোয়াভাবে শিক্ষার সম্প্রসারণের পক্ষে সওয়াল করতে দেখি। এমন বেশ কিছু দেশ আছে যেখানে ধর্মীয় অবদমনের ভয় এত সর্বব্যাপ্ত এবং এই অবদমনের ফলশ্রুতি সংক্রান্ত দুর্ভাবনা এতই তীব্র যে সমাজের সর্বশ্রেণির মানুষ চাতকের মতো শিক্ষার দিকে চেয়ে থাকে আর ধর্মীয় প্রবৃত্তিকে খর্ব করতে পারে শিক্ষার এমন যে কোনো অংশকে গলাধঃকরণ করে। অন্যত্র, কখনও কখনও রাষ্ট্রই তার নিজের স্বার্থে যথাসম্ভব ব্যাপ্তভাবে শিক্ষার প্রসার ঘটানোর চেষ্টা করে, যেহেতু শিক্ষার সবচেয়ে শক্তিশালী বাঁধনছেঁড়ার প্রয়াসকেও কাবু করে ফের বাঁধন পরাতে রাষ্ট্র নিজের শক্তির উপর আত্মবিশ্বাসী এবং যেহেতু সে বারবার দেখে নিয়েছে যে অন্য সব রাষ্ট্রের সঙ্গে প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে একটি সুশিক্ষিত সরকারি-চাকুরে-মণ্ডলী ও সেনাবাহিনি খুবই কাজের জিনিস। এই পরবর্তী ক্ষেত্রে অবশ্য শিক্ষার জটিল ও সূক্ষ্ম স্থিতিস্থাপকতাসম্পন্ন তোরণকে ধরে রাখার মতো চওড়া ও দৃঢ় ভিত্তির উপর রাষ্ট্রের গাঁথুনি হওয়া চাই। আর পূর্ববর্তী ক্ষেত্রে ধর্মীয় অবদমনের ইতিহাস ততটাই অনুভবনীয় হওয়া চাই যা এই বেপরোয়া প্রতিবিধান-চিন্তার দিকে ঠেলে দিতে পারে। সংক্ষেপে বললে, যখনই জনগণ সার্বজনীন জনশিক্ষার জন্য সংগ্রামের ডাক দেয়, আমি নির্ধারণ করার চেষ্টা করি যে তা কোথা থেকে উৎসারিত হচ্ছে— বিষয়আশয় হস্তগত করার অনিয়ন্ত্রিত আকাঙ্খা থেকে, পূর্ববর্তী ধর্মীয় অবদমনের কলঙ্ক থেকে, নাকি রাষ্ট্রের নিজস্বার্থ-চরিতার্থতার হিসাব কষা থেকে।

“অন্যপক্ষে, আর একটা সুরও আমি নানা মহল থেকে উঠতে দেখি, যা অত উচ্চস্বর না হলেও অন্তত একইরকম জোরালো, যা শিক্ষার সংকীর্ণকরণ দাবি করে। বিদ্যায়তনিক পরিসরের যে কোনো বৃত্তের মানুষ আপনার কানে এই সুরে কিছু না কিছু কলি গুনগুন করে গাইবেই। সেই কলিতে থাকবে এই সর্বজনস্বীকৃত তথ্য যে বর্তমান ব্যবস্থা বিদ্যার্থীদের বিদ্যায়তনিক শৃঙ্খলাসমূহের নেহাত দাসে পরিণত করে, যার ফলে যে কোনও বিদ্যার্থীর প্রকৃত শিক্ষিত হয়ে ওঠার সম্ভাবনা নিছক আকস্মিকতায় পরিণত হয়ে এখন প্রায় অসম্ভব হয়ে উঠছে। বিদ্যায়তনিক চর্চা এখন এত বড় ক্ষেত্র জুড়ে ছড়িয়ে গেছে যে মেধাবী কিন্তু ব্যতিক্রমী রকমের মেধাবী নয় এমন কোনওজন বিশেষীকৃত একটি ছোট

উপক্ষেত্রের মধ্যেই নিজেকে নিয়োজিত করে, সেই উপক্ষেত্রের বাইরে আর কোথায় কী ঘটছে সে সম্পর্কে কোনও ভাবনাই তার আর থাকে না।[৪] তার ফলে সে নিজের বেছে নেওয়া উপক্ষেত্রে সে যদি বা অশিক্ষিত জনের থেকে উঁচু স্তরে বিচরণ করে, বাকি সমস্ত ক্ষেত্রে— সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে— সে অশিক্ষিত জনের সঙ্গে সম্পূর্ণ একই স্তরে পড়ে থাকে। ওইরকম বিশেষিকৃত অধ্যয়নক্ষেত্রের মধ্যে সীমাবদ্ধ বিদ্বজ্জন একজন এমন কারখানা-শ্রমিকের সমতুল যে তার গোটা কর্মজীবন কেবল একটি নির্দিষ্ট যন্ত্রের জন্য একটি স্ক্রু বা একটি হাতলই তৈরি করে গেলেন এবং, বলা বাহুল্য, সে কাজে অবিশ্বাস্য রকমের পারঙ্গম হয়ে উঠলেন। যন্ত্রণাকর বিষয়কে ভাবনার মহিমাময় পোষাক পরিয়ে হাজির করতে অভ্যস্ত জার্মানিতে বিদ্বজ্জনদের মধ্যের এই সংকীর্ণ বিশেষজ্ঞ হওয়ার প্রবণতার মধ্য দিয়ে প্রকৃত শিক্ষা থেকে আরও দূরে সরে যাওয়ার ঘটনাকে প্রশংসা করা হয়ে থাকে, এমনকি নীতিগতভাবেও তার প্রশংসা গাওয়া হয়: 'পুঙ্খানুপুঙ্খের মধ্যে ডুবে যাওয়া' বা 'একঘেয়ে মেহনত'-য়ের গৌরব গেয়ে নিজের সংকীর্ণ ক্ষেত্রের বাইরের সমস্ত সংস্কৃতি সম্পর্কে অজ্ঞতাকে সম্মানচিহ্নে ভূষিত করা হয়, বলা হয় যে তা হল আদর্শ বিবেচনাবোধের পরিচয়।[৫]

"এমন বহু শতাব্দী গত হয়েছে যখন এটাই স্বতসিদ্ধ বলে ধরে নেওয়া হতো যে বিদ্বৎজনেরা শিক্ষিত হবে আর শিক্ষিতেরাই বিদ্বৎজন হবে। কিন্তু আমাদের সময়ে এসে আমরা যা দেখছি তাতে শিক্ষিত ও বিদ্বৎজনের মধ্যে কোনও সমীকরণ করা খুবই মুশকিল। সর্বত্র এখন কোনও বিরোধিতা ছাড়াই ধরে নেওয়া হয় যে বিজ্ঞান ও বিদ্যাচর্চার সেবায় জনগণকে নিঙড়ে নিতে হবে।[৬] কিন্তু যে বিদ্যাচর্চাপ্রণালী তার অনুগামীদের এমন রক্তখেকোর মতো শুষে ছিবড়ে করে দেয়, তা কি সত্যিই এত মূল্যবান— এই প্রশ্ন কি কেউ করে? ধর্মবিশ্বাস কখনও কখনও যা করার চেষ্টা করে, বাস্তবত বিদ্যায়তনিক শ্রমবিভাজন সেই একই কাজ করছে— তা শিক্ষাকে সংকুচিত করছে, এমনকি ধ্বংস করছে। কিছু কিছু ধর্মবিশ্বাসের ক্ষেত্রে, তাদের উৎস ও ইতিহাসকে মাথায় রাখলে, এই ভূমিকা সম্পূর্ণ যুক্তিসঙ্গত বলা যায়, কিন্তু বিদ্যাচর্চার ক্ষেত্রে এ আত্মহত্যার শামিল হতে পারে। আমরা ইতিমধ্যেই এমন একটা পর্যায়ে পৌঁছে গেছি যেখানে যে কোনও গুরুতরসাধারণ প্রশ্নে, বিশেষ করে সবচেয়ে গভীর দার্শনিক সমস্যাবলীর ক্ষেত্রে বিজ্ঞানী বা তথাকথিত বিদ্যাচর্চাকারীদের কিছুই বলার থাকছে না, আর সেই অবসরে এসব বিষয়ে বিচার বিবেচনার ছড়ি ঘোরাচ্ছে সাংবাদিকতা নামক সেই

অতি জোলো চ্যাটচেটে পদার্থ যা সমস্ত বিজ্ঞান-বিষয়ের ফাঁকফোকরে সেঁধিয়ে বসে আছে। সাংবাদিকতার নাম থেকেই তার দিনমজুর সুলভ চরিত্র প্রকাশ্য, সেই চরিত্র অনুযায়ীই সে তার এই ভূমিকা পালন করছে।

"শিক্ষার বিস্তার এবং তার সংকীর্ণায়ন— এই দুটি প্রবণতা সাংবাদিকতার মধ্যে এসেই পরস্পর অভিসারী হয়ে উঠছে। দৈনিক সংবাদপত্র কার্যত শিক্ষাকে প্রতিস্থাপিত করেছে। এখনও যারা শিক্ষা-সংস্কৃতির দাবি রাখে, এমনকি কোনও বিদ্বজ্জনও প্রতিটি জীবনাকার, সামাজিক অবস্থান, চারুকলা, বিজ্ঞান ইত্যাদি প্রতিটি ক্ষেত্রের মধ্যস্থ ফাঁকগুলোকে উচ্ছিষ্ট দিয়ে ভরার জন্য সাংবাদকিতার এক প্রকার আঠালো স্তরের উপর ভরসা করে— যার স্থায়ীত্ব বা দৃঢ়তা যে ফিনফিনে কাগজের উপর তা ছাপা হয় তারই সমতুল। আজকের শিক্ষাব্যবস্থার অভীষ্ট সংবাদপত্রের মধ্য দিয়েই সবচেয়ে ভালো প্রতিফলিত হচ্ছে। আর ঠিক তেমনই, যে জিনিয়াসরা আমাদের মুহূর্তের দাসবৃত্তি থেকে মুক্ত করে যুগযুগান্তের পথপ্রদর্শকের ভূমিকা নিত, তাদের শূন্য জায়গায় অধিষ্টিত হয়েছে বর্তমান মুহূর্তের দাস সাংবাদিককূল।

"শিক্ষার জন্য প্রকৃত পরিশ্রম ও প্রচেষ্টাকে এই যেভাবে উলটে দিয়ে বিকৃত করা আজ সর্বত্র আধিপত্য বিস্তার করেছে, তার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করার আশা আমি কীভাবে করতে পারি তা আমায় বলে দিন, আমার অতি পূজনীয় গুরুমশাই। একজন বিচ্ছিন্ন একাকী শিক্ষক হিসেবে কতটা সাহস আমার বজায় থাকতে পারে যখন আমি খুব ভালোভাবেই জানি যে আমার বপন করা প্রকৃত শিক্ষার প্রতিটি বীজকে এই ছদ্মশিক্ষার স্টীমরোলার ভেঙে গুঁড়িয়ে দিয়ে যাবে? ভাবুন তো কী অর্থহীন হয়ে দাঁড়ায় একজন শিক্ষকের কঠিনতম পরিশ্রম যখন একজন ছাত্রকে আমাদের সংস্কৃতির সত্যিকারের গর্ভগৃহ সেই অনন্ত দূরত্বের কষ্টগ্রাহ্য হেলেনিয় জগতে নিয়ে যাওয়ার সর্বত চেষ্টার এক ঘন্টা পরই দেখা যায় যে সেই ছাত্র সেসব ফেলে হাত বাড়াচ্ছে কোনও সংবাদপত্রের দিকে, বা জনপ্রিয় কোনও উপন্যাসের দিকে বা তেমন কোনও বুদ্ধিবৃত্তিচর্চার বইয়ের দিকে যা বর্তমান শিক্ষাগত বর্বরতার প্রতিটি ন্যক্কারজনক প্রবণতায় আচ্ছন্ন!"

"আচ্ছা, আচ্ছা!" দার্শনিক জোরালো সমবেদনা-ভরা কন্ঠে বলে উঠলেন, "এখন আমি তোমাকে আরো ভালো করে বুঝতে পারছি। আগে আমার অতো ভর্ৎসনা করা উচিত হয়নি। তুমি যা বলছ সবই ঠিক, কেবল তোমার এত নিরুৎসাহিত হয়ে পড়াটা ঠিক নয়। আমি তবে কিছু কথা বলি যা হয়ত তোমায় উপশম দিতে পারে।...

“তোমাকে এত ভারাক্রান্ত করে তুলেছে যে চালু শিক্ষাগত অভ্যাস, তা আজকের বিদ্যালয়গুলো আর কতদিন ধরে রাখতে পারবে বলে তোমার মনে হয়? আমার যা মনে হয় তা আমি গোপন করব না। আমার মনে হয় যে তাদের যুগ শেষ হয়ে গেছে, আর হাতে গোনা দিনই তাদের আয়ু অবশিষ্ট আছে। প্রথম যে ব্যক্তিটি সাহস করে সম্পূর্ণ সততার সঙ্গে তাদের সম্পর্কে সত্যি কথাটা বলতে পারবে, আরও হাজারো সাহসী হৃদয় থেকে সে তার কথার প্রতিধ্বনি শুনতে পাবে। কারণ, আজকের যুগের মানুষের সমস্ত সদগুণ ও উষ্ণ আবেগের তলে চাপা পড়ে আছে একটাই অকথিত সাধারণ আকাঙ্খা: প্রত্যেকেরই স্মরণে আছে বিদ্যলয়ে তাদের কী ভোগান্তিই না পোহাতে হয়েছিল, আর তাই তারা আর কিছু না হোক নিজেদের বিপন্ন করে হলেও নিজেদের উত্তরসূরীদের সেই দুর্ভোগের ব্যবস্থার হাত থেকে রক্ষা করতে চায়। কিন্তু বর্তমানকালের শিক্ষাতাত্ত্বিক চর্চার নিদারুণ প্রাণাভাবের দরুন এই আকাঙ্খা কখনই খোলাখুলি উচ্চারিত হয়না। আমাদের এখানে এমন কোনও সত্যিকারের সৃজনশীল প্রতিভা নেই, অর্থাৎ নতুন ভালো ধ্যানধারণা সমেত এমন কোনও কাজের লোক নেই যার এই জ্ঞান আছে যে প্রকৃত বিরল প্রতিভা ও সঠিক চর্চা আবশ্যিকভাবেই সহগামী। আমাদের হাতুড়ে পেশাজীবীদের মগজে কোনও ভালো ধ্যানধারণা নেই, তাই কোনও সঠিক চর্চাও নেই। আজকালকার শিক্ষাতাত্ত্বিক লেখাপত্রগুলোর উপর চোখ বোলালে সেগুলোর নিদারুণ প্রাণাভাব ও নিজের লেজকে নিজে তাড়া করে ঘোরার করুণ প্রহসন দেখে চূড়ান্ত বীতশ্রদ্ধ না হয়ে উপায় নেই। এখানে আমাদের দর্শনের শুরু হতে হবে বিস্ময় থেকে নয়, বীতশ্রদ্ধা থেকে। হেন বীতশ্রদ্ধার বোধ যার মধ্যে জাগবে না, তার শিক্ষাতাত্ত্বিক বিষয়ে আর মাথা না ঘামানোই মঙ্গল। অবশ্য এখনও অবধি এর উল্টোটাই নিয়মে পরিণত হয়েছে। তোমার মতো যে অভাগারা বীতশ্রদ্ধ হয়েছে, তারা অস্থির হয়ে পলায়নপর হয়েছে, আর কোনওরূপ বীতশ্রদ্ধার বোধ যাদের নেই সেই তথাকথিত বোধবুদ্ধিবানরা তাদের আনাড়ি হাতে শিক্ষার প্রক্রিয়ার মতো এই সবচেয়ে সূক্ষ্ম শিল্পটির দফারফা করে। কিন্তু অচিরেই আর এমনটা সম্ভবপর থাকবে না। কেবলমাত্র একজন সৎ ব্যক্তি যদি ভালো নতুন ধ্যানধারণা ও তা প্রয়োগ করে বাস্তবায়িত করার সাহস নিয়ে এগিয়ে আসে তাকে ঘিরে থাকা কারো বা কোনোকিছুর সঙ্গে সংঘাতের তোয়াক্কা না করে, একটি উজ্জ্বল উদাহরণও যদি সে খাড়া করতে পারে যা এতদিনকার ছড়ি ঘোরানো আনাড়ি হাতেদের পক্ষে অনুকরণ করাও অসম্ভব, তাহলে জনসাধারণের দেখার চোখ খুলে যাবে, তারা

পার্থক্য অনুভব করবে আর অন্তত সেই পার্থক্যের কারণ কী তা নিয়ে ভাবার সুযোগ পাবে। এখন অনেকে সৎভাবেই বিশ্বাস করে যে শিক্ষাতত্ত্বের শিল্প কোনও আনাড়ি হাতের কাজ হতে পারে, তখন তাদের এই বিশ্বাস ভেঙে যাবে।"

দার্শনিকের তরুণ সঙ্গী বলে উঠল, "সম্মানীয় গুরুদেব, কত না সাহসিকতার সঙ্গে আপনি আপনার আশার কথা বললেন। যাতে আমি এ আশার শরিক হতে পারি তার জন্য আপনি দয়া করে আমাকে অন্তত একটা দৃষ্টান্ত দেখান। যেমন ধরুন জিমনাসিয়াম (প্রাথমিক বিদ্যালয়)-য়ের কথা, যার সঙ্গে আমরা উভয়েই পরিচিত। আপনি কি সত্যিই মনে করেন যে সততা ও নতুন ভালো ধ্যানধারণার মধ্য দিয়ে জিমনাসিয়ামগুলোয় গেঁড়ে বসে থাকাএকগুঁয়ে পুরানো অভ্যাসের জড় ভাঙা সম্ভব? যে কোনও মুষলদণ্ডের আঘাত সয়ে নেওয়ার মতো শক্তপোক্ত পাঁচিল তুলে জিমনাসিয়ামগুলো নিজেদের ঘিরে রেখেছে— কিন্তু আমার মনে হয় সেগুলোই তাদের আত্মরক্ষার মূল বর্ম নয়, সেই মূল বর্ম তাদের অনুসৃত সমস্ত নীতির মারাত্মক পিচ্ছিল নাছোড়বান্দা চরিত্র দিয়ে তৈরি। তার বিরুদ্ধে দাঁড়ালে এমন কোনো স্পর্শগ্রাহ্য দৃষ্টিগ্রাহ্য বিপক্ষকে সামনে পাওয়া যায় না যাকে চূর্ণ করে দেওয়া যেতে পারে, কেবল মুখোশধরা এমন এক শত্রু ভেসে বেড়ায় যে হাজারোবার আকার বদলায়, পিছলে সরে যায়, ভীরুর মতো পালায় আবার হঠাৎই অতর্কিতে ঝাঁপ মেরে প্রত্যাঘাত করে বিরুদ্ধতাকারীকে হতভম্ব করে দেয়। বিশেষ করে এই জিমনাসিয়ামের হালহকিকতই আমাকে চূড়ান্ত নিরাশায় ঠেলে দিয়ে একাকীত্বের মধ্যে মুখ গুঁজতে বাধ্য করেছিল। কারণ, আমার মনে হয়েছিল যে এখানে যদি যুদ্ধটা জেতা যায়, তাহলে অন্যান্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোতেও তার হাত ধরেই জয় আসবে, কিন্তু এখানে হেরে গেলে আর সব শিক্ষাতাত্ত্বিক গুরুতর প্রশ্নগুলোতেও হাল ছেড়ে দেওয়া ছাড়া কোনও উপায় নেই। তাই গুরুদেব, আমায় বলুন কী আশা আমরা পোষণ করতে পারি যে জিমনাসিয়ামের বর্তমানাবস্থার ধ্বংসের মধ্য দিয়ে তার পুনর্জন্ম হবে?"

উত্তরে দার্শনিক বললেন, "তুমি যেমনটা বললে, আমিও জিমনাসিয়ামের গুরুত্ব ঠিক ততটাই বলে মনে করি। অন্য সমস্ত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানকে তার নিজের নিজের শিক্ষাগত লক্ষ্যের নিরিখে বিচার করা যায়, কিন্তু জিমনাসিয়াম যদি বিপথে চালিত হয়, তাহলে তার প্রভাব পড়বে অন্য সমস্ত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের উপর। জিমনাসিয়ামকে পরিশুদ্ধ নতুন চেহারা দিতে পারলে বাকি সব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের পরিশুদ্ধি ও নবায়নের পথও খুলে যাবে। এই কেন্দ্রীয় নির্ধারক

গুরুত্বের জায়গা এমনকি বিশ্ববিদ্যালয়ও আর এখন দাবি করতে পারে না। আমি পরে বিস্তারিত করছি এমন এক গুরুত্বপূর্ণ দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে বিশ্ববিদ্যালয়কে বর্তমানাবস্থায় জিমনাসিয়ামের একটি প্রসারণ বলেই ধরা উচিত।

"এখন দেখা যাক কেন আমি আশাবাদী যে দুটো সম্ভাবনার মধ্যে যে কোনো একটা অবধারিতভাবে ঘটতে চলেছে:জিমনাসিয়ামের যে চিত্রবিচিত্র ও অনির্দিষ্ট ধারণা আমাদের উপর এসে বর্তেছে, হয় তা কর্পূরের মতো শূন্যে মিলিয়ে যাবে, আর নয়তো তা একেবারে ভিত্তিভূমি থেকে শোধিত হয়ে নতুন আকার ধারণ করবে। কেবল সাধারণ কথা আউড়ে তোমায় ক্লান্ত না করে, মূর্তভাবে এমন এক অভিজ্ঞতা থেকে শুরু করা যাক যা জিমনাসিয়ামে আমাদের প্রত্যেকেরই হয়েছে এবং এখনও সবার হয়ে চলেছে। খুঁটিয়ে বিচার করলে, আজকের জিমনাসিয়ামে জার্মান ভাষার ক্লাস কী হয়ে দাঁড়িয়েছে?

"প্রথমে বলা যাক যে তা কী হওয়া উচিত। আজকালকার দিনে প্রত্যেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে এত নিচুমানের বাজে জার্মানে কথা বলে ও লেখে যা কেবলমাত্র সংবাদপত্রের জার্মানের রবরবার যুগেই সম্ভব।[৭] সেই কারণেই যে কোনও প্রতিভাবান তরুণকে জোর করে সুরুচি ও কঠোর ভাষিক শৃঙ্খলার ঘেরাটোপের মধ্যে এনে লালন করা উচিত। তা যদি আর সম্ভব না হয়, তাহলে আমাদের এই অধঃপতিত ও ধ্বংসপ্রাপ্ত ভাষারূপ ব্যবহারের লজ্জা সওয়ার চেয়ে কেবলমাত্র লাতিন বলায় ফিরে যাওয়া ভালো।

"ভাষার কথা ধরলে, উচ্চশিক্ষার কোনও প্রতিষ্ঠানের আর কী কাজ থাকতে পারে যদি না সে ভাষার ক্ষেত্রে বিশৃঙ্খল ও বিস্রস্ত তরুণদের সুগম্ভীর কঠোরতার সাথে সঠিক পথ দেখাতে পারে ও এই প্রাধিকারসম্পন্ন নির্দেশ জারি করতে পারে:'নিজের ভাষায় গুরুত্ব দাও! এই ক্ষেত্রে যদি নিজের পবিত্র কর্তব্য না অনুভব করতে পার তাহলে তোমার মধ্যে উচ্চ সংস্কৃতির বীজটিও নেই। শিল্পকলাকে তুমি কতটা সম্মান কর বা তার প্রতি তোমার কতটা আসক্তি আছে তা বোঝা যায় মাতৃভাষার প্রতি তোমার আচরণের মধ্য দিয়ে। আজকালকার সাংবাদিকতায় দস্তুর হয়ে ওঠা কতিপয় শব্দ ও বাক্যাংশের প্যাঁচপয়জার যদি তোমার মধ্যে না বিবমিষার উদ্রেক করে, তাহলে সংস্কৃতির পিছু ছুটে তোমার কাজ নেই। আজকের সংস্কৃতিবান মানুষদের কী কঠিন ও বিপুল কর্তব্যের মুখোমুখি হতে হচ্ছে এবং তোমাদের অনেকেরই প্রকৃত শিক্ষিত হয়ে ওঠার

সম্ভাবনা কতটা কম তা বিচার করার কষ্টিপাথর তখনই হাজির হয়ে যাচ্ছে যখন তুমি কিছু লিখছ বা বলছ।'

"এই যদি জিমনাসিয়ামের নির্দেশ হতো, তাহলে জার্মান ভাষাশিক্ষকের কর্তব্য হতো 'তলব করা', 'পকেটস্থ করা', 'সুযোগ নেওয়া', 'না বললেও চলে' ইত্যাদি ক্লান্তিকর জবরজঙগুলোর ব্যবহার কঠোরভাবে নিষিদ্ধ করা এবং শিক্ষার্থীদের তাতে গুরুত্ব দেওয়ার পরিস্থিতিও তৈরি হতো। সেই শিক্ষকের আরও কাজ থাকত। আমাদের ধ্রুপদী লেখকদের লেখাগুলো লাইন ধরে পড়িয়ে তিনি বুঝিয়ে দিতেন যে বাক্যাংশের প্রতিটা ভাঁজ কতটা মনোযোগের সঙ্গে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বিচার করা জরুরী যদি আমরা একইসঙ্গে শিল্পকলার প্রতি খাঁটি হৃদয়ানুভূতি ও পরিপূর্ণ বোধ্যতায় গুরুত্ব দিই। শিক্ষক তাঁর শিক্ষার্থীদের বাধ্য করতেন একই চিন্তাকে বারংবার বিভিন্নভাবে প্রকাশ করতে, প্রতিবারই আগেরবারের থেকে যেন আরেকটু ভালো হয়, যতক্ষণ না তিনি তুলনায় কম প্রতিভাধরদের মধ্যে ভাষার প্রতি একটি সশ্রদ্ধ বিস্ময় উদ্রেক করতে পারছেন আর তুলনায় বেশি প্রতিভাধরদের মধ্যে উন্নত চরিত্রের আগ্রহ সঞ্চারিত করতে পারছেন।

"এটাই হল তথাকথিত রীতিসিদ্ধ শিক্ষার কর্তব্য, যা সবচেয়ে মূল্যবান কর্তব্যগুলোর একটি। কিন্তু তথাকথিত রীতিসিদ্ধ শিক্ষার বর্তমান পীঠস্থান আজকালকার জিমনাসিয়ামে আমরা কী দেখতে পাই? সেখানের কান্ডকারখানা যে কোনো সৎ বিচারকের মনে কোনও ধন্দ রাখবে না। এই জিমনাসিয়ামগুলোর উৎপত্তি হয়েছিল নিছক অধীত জ্ঞানকে অভ্যাস ও আয়ত্ত করার প্রক্রিয়ার জন্য, শিক্ষা-সংস্কৃতিকে লালনপালন করার জন্য নয়।[৮] এখন তারা তাদের সেই সীমিত কর্তব্যটুকুকেও জলাঞ্জলি দিয়ে নিছক সাংবাদিকতাকে মোক্ষ করেছে। এই প্রবণতা সবচেয়ে প্রকটভাবে ধরা পড়ে জার্মান ভাষাশিক্ষার ক্ষেত্রে।

"খাঁটি ব্যবহারিক প্রশিক্ষণ দেওয়া ও কঠোর ভাষাচর্চার মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থীদের পুরোদস্তুর আত্মোন্নতির পথের সঙ্গে পরিচিত করা— হে কাজের বদলে সর্বত্রই শিক্ষকরা মাতৃভাষার প্রতি এক প্রকার পাণ্ডিত্যপূর্ণ ইতিহাসবিদ্যক অবস্থান নিচ্ছেন। মাতৃভাষার বর্তমান বা ভবিষ্যৎ, কোনওকিছুর প্রতিই তাঁদের কোনও দায়বদ্ধতা নেই। তাঁরা জার্মান ভাষা পড়াচ্ছেন এমনভাবে যেন সেটি একটি মৃত ভাষা। এই ইতিহাসবিদ্যক পণ্ডিতি আমাদের এই সময়ে এতই সর্বব্যাপী হয়ে উঠেছে যে এমনকি আমাদের মাতৃভাষার জ্যান্ত শরীরটাকেও লাশকাটা টেবিলে তোলা হচ্ছে ছিঁড়েকুটে দেখার জন্য। কিন্তু শিক্ষা তখনই শুরু

হতে পারে যখন এই বোধ থাকে যে একটা জ্যান্ত শরীর প্রাণহীন নয়। তাই একজন শিক্ষাদানকারীর সর্বাগ্রগণ্য কর্তব্য হল চারদিক থেকে হামলে পড়া এই ইতিহাসবিদ্যক পণ্ডিতিকে প্রশমিত করে কাজ শুরু করা, বিশেষ করে যখন কাজটা নেহাতই কিছু বোঝাবুঝির বিষয় নয়, বরং যথার্থ স্বতক্রিয়ার বিষয়। শিক্ষার্থীদের শিখতে হবে তার মাতৃভাষার যথার্থ প্রয়োগ ও ব্যবহার— এই ব্যবহারিক প্রেক্ষিতটিই আমাদের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোয় জার্মান ভাষাশিক্ষার একমাত্র যুক্তি হতে পারে। কিন্তু বলা বাহুল্য যে ইতিহাসবিদ্যক পণ্ডিতির ঠাটবাট নিয়ে চলা হল আমাদের শিক্ষকদের পক্ষে তুলনায় সহজ ও আরামপ্রদ বিকল্প কারণ তাতে পরিশ্রম ও ইচ্ছাশক্তির জোর লাগে অনেক কম এবং অপেক্ষাকৃত কম মেধাসম্পন্নরাও ওভাবে তরিয়ে যেতে পারে।[৯] সহজ ও আরামপ্রদ যে ফাঁকিবাজি তা সবসময় নিজেকে জাঁকালো পারিভাষিক শব্দে মুড়ে বাহ্যাড়ম্বরের জমকে গরীয়ান করে রাখে— এ আমরা আজ শিক্ষাতত্ত্বক্ষেত্রের প্রতিটা বিভাগে দেখতে পাচ্ছি। প্রকৃত শিক্ষার জন্য উপযুক্ত যে ব্যবহারিক প্রয়োগরীতি, যা সত্যিই কার্যকরী হতে পারে, তা সবসময়ই মূলগতভাবে অনেক বেশি কঠিন ও পরিশ্রমসাধ্য। তাই সেই প্রকৃত প্রয়োগরীতির দিকে বিদ্বেষ-অবজ্ঞা-উপেক্ষার বক্রদৃষ্টি হেনে সবাই পাশ কাটিয়ে যায়। যে ব্যক্তি সৎ, তাকে এই চলমান বেসাতির পর্দা ফাঁস করতে হবে— নিজের কাছে এবং অন্যদের কাছেও।

"এইসব পণ্ডিতি বিচার-বিবেচনা বাদ দিলে একজন শিক্ষক সাধারণত জার্মান ভাষা চর্চা করার জন্য আর কী প্রবর্তনা হাজির করেন? তাঁর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের আত্মার সঙ্গে জার্মানজাতির সেই কতিপয় প্রকৃত শিক্ষিত সদস্য, ধ্রুপদী কবি ও কলাবিদদের আত্মার যোগসাধন করার কী উপায় তিনি গ্রহণ করেন? এ এক অন্ধকারাচ্ছন্ন সন্দেহপূর্ণ পরিসর হয়ে আছে, আর আলো ফেলে সেই অন্ধকারের আড়াল সরানোর জন্য রাতিমতো সাহস প্রয়োজন, কিন্তু তাই বলে কি আমরা চোখ ঘুরিয়ে রাখতে পারি, এখানেও তো একদিন সবকিছুকে নতুন করে গড়ে তুলতে হবে। আজকালকার জিমনাসিয়ামে শিক্ষার্থীদের কাঁচা মনটা আমাদের হালের সাংবাদিকতাসুলভ রুচিজ্ঞানের অসুস্থ বৃত্তিগুলোর ছাঁচে পড়ে যায়। স্বয়ং শিক্ষকই নিজহাতে আমাদের ধ্রুপদী লেখকদের সম্পর্কে স্থূল ভুলবোঝার বীজ বুনে দেন, আর এই ভুলবোঝার কামনাই একদিন পল্লবিত হয়ে ফুলে-ফলে ভরে উঠে শিল্পতাত্ত্বিক সমালোচনাশাস্ত্রের ভেক ধরে হাজির হয় যদিও তা উদ্ধত বর্বরতা ছাড়া আর কিছুই নয়। আমাদের অতুলনীয় শিলার[১০] সম্বন্ধে ছেলেমানুষি আত্মম্ভরীতা নিয়ে কথা বলতে শেখে আমাদের শিক্ষার্থীরা।

শিলারের সবচেয়ে মহান ও সবচেয়ে জার্মান যে সৃষ্টিগুলি— যেমন, ডন কার্লোস-য়ের পোসা-র মার্কুই, ওয়ালেনস্টেইন-য়ের ম্যাক্স ও থেকলা— তাদের সম্বন্ধে কথা উঠলে মুখে একটা উদ্ধত বাঁকা হাসি ঝুলিয়ে রাখতে শিখেছে শিক্ষার্থীরা, যা জার্মান জাতির আত্মাকেই ধুলোয় টেনে নামায়, আর এর চেয়ে ভালো ভাবে শিক্ষিত কোনো ভবিষ্যৎ প্রজন্ম হয়ত যা স্মরণ করে লজ্জায় মাথা হেঁট করবে।

"আজকের জিমনাসিয়ামের জার্মান ভাষার শিক্ষকদের কাজের তৃতীয় এবং শেষতম ক্ষেত্র, যা আবার প্রায়শই তাদের ভূমিকার শীর্ষভাগ বা এমনকি গোটা জিমনাসিয়াম শিক্ষারই শীর্ষবিন্দু হিসেবে বিবেচিত হয়, তা হল তথাকথিত জর্মান প্রবন্ধ রচনা। প্রায় ব্যতিক্রমহীনভাবে সবচেয়ে প্রতিভাবান শিক্ষার্থীরাই এই প্রবন্ধরচনার কাজ সবিশেষ আনন্দের সঙ্গে গ্রহণ করে, আর কেবলমাত্র এই বিবেচনা থেকেই স্পষ্ট হয়ে যাওয়া উচিত যে এই কাজ একইসঙ্গে কতটা লোভনীয় আবার কতটা বিপদজনক। প্রবন্ধরচনা শিক্ষার্থীর ব্যক্তিসত্বার কাছে আবেদন রাখে; একজন শিক্ষার্থী তার নিজের স্বাতন্ত্র্য সম্পর্কে যত সচেতন হয়, ততই সে তার জার্মান প্রবন্ধের উপর নিজের ব্যক্তিগত ছাপকে মুদ্রিত করে। বেশিরভাগ জিমনাসিয়াম এমনকি এই 'ব্যক্তিগত ছাপ'-কে টেনে বের করতে চায় প্রবন্ধরচনার বিষয় নির্বাচনের মধ্য দিয়ে, যা সবচেয়ে ভালো বোঝা যায় এর থেকে যে প্রথমদিকের ক্লাসে শিক্ষার্থীদের নিজেদের জীবন ও বড় হওয়ার অভিজ্ঞতাকে বর্ণনা করতে বলা হয়— যে প্রবন্ধবিষয়ের সঙ্গে মূলগতভাবেই শিক্ষার কোনও যোগ নেই। জিমনাসিয়ামগুলোয় কী কী বিষয়ে প্রবন্ধরচনা করতে দেওয়া হচ্ছে তার তালিকার উপর একবার চোখ বোলালেই আর কোনো সন্দেহ থাকে না যে শিক্ষার্থীদের কি বিপুল গরিষ্ঠ অংশ নিজেদের কোন দোষ ছাড়াই এই অপরিপক্ক অবস্থায় ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য নির্মাণের তাড়াহুড়োর ঘা গোটা জীবন ধরে বয়ে বেড়াবে। দেদার কত এমন লেখকপ্রবরের দেখা আমরা পাই যাদের গোটা লিখনজীবনটাই শৈশবে আত্মার বিরুদ্ধে সংঘটিত এই শিক্ষাবৃত্তীয় আদিম পাপের করুণ পরিণতি বয়ে চলা ছাড়া আর কিছু হয়ে উঠতে পারে না!

"যখন কেউ অপরিণত বয়সে অমন একটি প্রবন্ধ উৎপাদন করে, তখন ঠিক কী ঘটে একবার ভাবো। সেটাই তার প্রথম নিজস্ব লিখন, তার তখনও অপরিপক্ক ক্ষমতা প্রথম দানা বেঁধে আকার ধারণ করেছে, স্বাধীন স্বতন্ত্র হওয়ার জন্য ঠেলা ফলাফলটিকে ঘিরে নতুনত্বের এক জাদুকরী আলোকবর্তিকা তৈরি করেছে, যার পুনরাবৃত্তি অসম্ভব। ডাক পেয়ে গহন থেকে জেগে উঠেছে তার

সমস্ত সহজাত স্পর্ধা; সবলতর কোনও বাধার অনুপস্থিতিতে অবারিত তার দেমাক সেই প্রথম লিখনরূপ ধারণ করেছে। সেই মুহূর্ত থেকে তরুণটি নিজেকে স্বয়ংসম্পূর্ণ বলে জ্ঞান করতে থাকে: যে কারও সঙ্গে সমপর্যায়ে গিয়ে সেয়ানে সেয়ানে মোলাকাত করতে সক্ষম বলে নিজেকে গণ্য করতে শুরু করে। প্রবন্ধরচনার যেহেন বিষয়সমূহ তাকে দেওয়া হয় সেগুলোই তাকে ঠেলে দেয় কাব্যের উপর নিজস্ব মতদান করতে, বা, চরিত্ররেখা আঁকতে গিয়ে ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্বদের একসঙ্গে দলা পাকিয়ে হাজির করতে, বা, গুরুতর নীতিনৈতিক সমস্যাকে হেলায় নিজের মতো করে সমাধা করতে, বা, এমনকি, স্বয়ং নিজেকে আলোকবৃত্তের কেন্দ্রে স্থাপন করে নিজের বিকাশের আদর্শায়িত ছবি এঁকে নিজের সত্বা সম্পর্কে চুলচেরা বিচারের প্রতিবেদন হাজির করতে। সংক্ষেপে বললে, যে কাজগুলি গভীর বুদ্ধিবৃত্তি ও আত্মবিশ্লেষণ দাবি করে সেগুলোকে এমন এক হতচকিত তরুণের হাতে সঁপা হয় যার মধ্যে তখনও অবধি বাস্তবত কোনও আত্মজিজ্ঞাসা-আত্মসচেতনতা জন্ম নেয়নি এবং তাকে নিজস্ব বিচার করতে বলা হয়।

"যে প্রথম নিজস্ব প্রচেষ্টা একজন তরুণ শিক্ষার্থীর গঠনে এতটা প্রভাব ফেলে, সেই বিষয়ে শিক্ষকদের আচরণ কী হয় তা এখন ভেবে দেখো। শিক্ষক কী কী বিষয়কে সমালোচনার যোগ্য বলে মনে করেন? কী কী বিষয়ে তিনি শিক্ষার্থীর মনোযোগ আকর্ষণ করেন? শিক্ষার্থীর সেই তরুণ বয়সে ভাবনাচিন্তার যে অমিতাচারিতা অত্যন্ত স্বাভাবিক, তা শিক্ষকের বিরূপ সমালোচনা ও তিরস্কারের বিষয় হয়। শিক্ষার্থীর মধ্যে যদি কোনো প্রকৃত স্বাতন্ত্র্য কুঁড়ি মেলে থাকে, যা ওই অপরিণত অবস্থায় খোঁচা খেয়ে আড়ষ্ঠ, অতিরঞ্জিত বা বিকট অভিব্যক্তির মধ্য দিয়ে প্রকাশিত হলেও যেটাই শিক্ষার্থীর ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যকে নির্দেশ করে, তাও একইভাবে শিক্ষকের বিরূপতা ও তিরস্কারের পাত্র হয়। এইসবকে তিরস্কার করে শিক্ষক সেইসমস্তকিছুকেই আদর্শ হিসেবে তুলে ধরেন যা অনুকরণপ্রসূত, রীতিসম্মত ও সমাজে সম্মানীয় বলে পরিচিত। হাত-পা-বাঁধা মধ্যমেধার চর্চাই শিক্ষকের অবসন্ন অনিচ্ছুক প্রশংসা আদায় করে নেয় কারণ সঙ্গত কারণে শিক্ষকও এর দ্বারা বীতশ্রদ্ধই হন।

"শিক্ষার্থীদের জন্য প্রবন্ধরচনার এহেন বিষয় নির্দিষ্ট করার প্রহসন যে আজকালকার জিমনাসিয়ামের সবচেয়ে অবাস্তব ও একইসঙ্গে সবচেয়ে বিপজ্জনক একটি বৈশিষ্ট্য তা হয়ত অন্য আর কেউও বুঝে থাকতে পারে। প্রবন্ধগুলো মৌলিকত্ব দাবি করে, অথচ ওই বয়সে যে মৌলিকত্ব সম্ভব তা

তখনই বাতিল করে দেওয়া হয়। এমন এক রীতিসিদ্ধ শিক্ষাকে এখানে পূর্বসিদ্ধান্ত হিসেবে ধরে নেওয়া হয় যা হয়ত তাদের পরিপক্ক বয়সে গিয়েও হাতে গোনা কয়েকজনই মাত্র অর্জন করতে পারবে। ধরে নেওয়া হয় যে প্রতিটি শিক্ষার্থীই সাহিত্যের জন্য সক্ষম, সবচেয়ে চিন্তাশীল ব্যক্তি ও বিষয় সম্পর্কে মতামত পোষণ করার অধিকারী। অথচ প্রকৃত শিক্ষার কাজ হল তার সর্বশক্তি দিয়ে তরুণ শিক্ষার্থীর বিচারের স্বনির্ভরতার এই হাস্যকর দাবিকে সংযত করে জিনিয়াসের রাজদণ্ডের সামনে কঠোর মান্যতা আরোপ করা। যে বয়সে শেষপর্যন্ত প্রতিটা লিখিত ও উচ্চারিত শব্দ বর্বরোচিত ঘৃণা হয়ে দাঁড়ায়, সেই বয়সে লেখকদের এক বৃহত্তর প্রেক্ষাপটে নিজস্ব ভাবনাকে হাজির করতে বলা হয়। আর একবারের জন্যও যেন আমরা ভুলে না যাই যে এই কাঁচা বছরগুলোয় পরিপাটী আত্মসন্তুষ্টি জাগিয়ে দেওয়া কতই না সহজ! যে তরুণ প্রথম আয়নায় তার সাহিত্যিক প্রতিবিম্ব প্রত্যক্ষ করছে, তার দেমাকের কথা একবার ভাবো! এই সমস্তকিছু বিবেচনা করলে আর কি কোনও সন্দেহ থাকতে পারে যে আমাদের চারদিকের শিল্প-সাহিত্যের বারোয়ারি পরিসর যেসব রোগলক্ষ্মণে আক্রান্ত, সেসব রোগের প্রকোপ অল্প বয়সেই প্রতিটি নতুন প্রজন্মের মধ্যে সঞ্চারিত করে দেয় জিমনাসিয়ামের এহেন চালচলন। রোগলক্ষ্মণগুলো হল: আত্মভক্তির তাড়ায় চালিত হঠকারী অতি-উৎপাদন, লজ্জাহীনভাবে বইয়ের পর বই উগরে চলা,[১১] শৈলীর ক্ষেত্রে নিদারুণ দারিদ্র্য, অপরিণত সব সূত্রায়ন যা চরিত্রবৈশিষ্ট্যহীনভাবে কায়ক্লেশে হামাগুড়ি দিয়ে চলে, সব নান্দনিক নীতি-আদর্শকে জলাঞ্জলি দেওয়া, বিশৃঙ্খলা-অব্যবস্থায় মজে থাকা, সংক্ষেপে বললে, যা যা আমাদের সাংবাদিকতাচর্চার ও ততোধিকই আমাদের বিদ্বৎজনদের লেখালেখির বৈশিষ্ট্য হয়ে উঠেছে।

হাতে গোনা কজনেরই বা আজ এই উপলব্ধি আছে যে হাজার জনের মধ্যে বড়জোর একজনই বিশ্বের সামনে তার নিজের লেখা হাজির করার যোগ্য হয়। সেইজন বাদে আর যারাই নিজেদের ঝুঁকিতে তা করতে যায়, তাদের প্রতিটা মুদ্রিত বাক্যের যথার্থ পুরস্কার হিসেবে প্রকৃত বিচারে সক্ষম পাঠকদের কন্ঠ থেকে হোমারিয় অট্টহাস্য ছাড়া আর কিছুই ধ্বনিত হয় না— কারণ, সত্যিই তো, সে এক ঈশ্বরের দর্শনযোগ্য প্রদর্শনী যেখানে এক সাহিত্যিক হেফায়েসটাস[১২] তাঁর সকরুণ নৈবেদ্য নিয়ে খোঁড়াতে খোঁড়াতে এগিয়ে আসছেন। চিন্তাশীল ও ছাড়হীন সমালোচনাত্মক বিচারের অভ্যাস ও মানসিকতা মনে মুদ্রিত করে দেওয়াই রীতিসিদ্ধ শিক্ষার অন্যতম সর্বোচ্চ কর্তব্য, আর তাই, প্রত্যেকজনের

তথাকথিত ‘স্বতন্ত্র ব্যক্তিসত্বা’-র সর্বব্যাপী উৎসাহদান কেবলমাত্র বর্বরতার চিহ্ন ছাড়া আর কিছুই নয়। অথচ, এতক্ষণ আমি যা বললাম তা থেকে কোনও সন্দেহ থাকতে পারে না যে জার্মান ভাষার ক্লাসগুলোকে এই ‘স্বতন্ত্র ব্যক্তিসত্বা’ উৎসাহিত করার জন্যই সাজানো হয়েছে, শিক্ষাদানের জন্য নয়। যতদিন অবধি এই জিমনাসিয়ামগুলো জার্মান ভাষায় প্রবন্ধরচনার নামে জঘন্য অবিবেচক কলমচালনাকে প্রশ্রয় দিয়ে যাবে, যতদিন অবধি আমাদের সবচেয়ে হাতের কাছের বস্তু কথ্য ও লিখিত ভাষার উপর ব্যবহারিক নিয়মানুবর্তিতা আরোপ করার পবিত্র কর্তব্য গ্রহণ করতে অস্বীকার করবে, যতদিন অবধি মাতৃভাষাকে একটি নাছোড় ঝুটঝামেলা বা একটি মৃতদেহ হিসেবে গণ্য করবে, ততদিন অবধি আমি এই জিমনাসিয়ামগুলোকে প্রকৃত অর্থে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান হিসেবে বিবেচনা করতে পারব না।

“সবচেয়ে বড় কথা হল, জিমনাসিয়ামগুলোর ভাষাশিক্ষা ধ্রুপদী আদর্শের দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার কোনো লক্ষ্মণই দেখায় না। আমার মতে, কেবলমাত্র এই কারণেই আমাদের জিমনাসিয়ামগুলো তথাকথিত ‘ধ্রুপদী শিক্ষা’ প্রদান করে বলে দাবিটি সন্দেহজনক ও ভ্রান্তিপূর্ণ বলে বলা যায়। প্রাচীন গ্রিক ও রোমানরা যে বিপুল গুরুত্ব দিয়ে কিশোরাবস্থা থেকেই ভাষার বিষয়টিকে বিবেচনা করত তা একনজরেই বোঝা যায়। এ ব্যাপারে ধ্রুপদী গ্রিক ও রোমান বিশ্বকে আদর্শস্থানীয় বলে বলা যায়— কারও চোখই তা এড়িয়ে যেতে পারে না!— জিমনাসিয়ামগুলোর শিক্ষা-পরিকল্পনায় ওই ধ্রুপদী বিশ্বকে সর্বোচ্চ ও সবচেয়ে শিক্ষণীয় আদর্শ হিসেবে তুলে ধরা হয় (যদিও কতটা আন্তরিকভাবে তা নিয়েও আমার সন্দেহ আছে), অথচ ওই ভাষাশিক্ষার আদর্শ কোনও গুরুত্ব পায় না। যখনই কেউ সংস্কৃতির বীজরোপণে জিমনাসিয়ামের অক্ষমতা নিয়ে অভিযোগ তোলে, তখনই শাক দিয়ে মাছ ঢাকার মতো করে জিমনাসিয়ামগুলো দাবি করে যে তারা ‘ধ্রুপদী শিক্ষা’-র বীজ বপন করছে। ধ্রুপদী শিক্ষা! শুনতে কত না উচ্চমার্গীয় লাগে! ওইরকম নজর-ঘোরানো ও ধাঁধিয়ে দেওয়ার মতো শব্দব্রক্ষ্মকে তলিয়ে দেখতে যেহেতু সময় লেগে যায়, তাই অভিযোগকারী সাময়িকভাবে হলেও বিভ্রান্ত হয়ে পড়ে।

“জিমনাসিয়ামগুলোর অভ্যাসই দাঁড়িয়ে গেছে এইরকম কৌশল অবলম্বন করা: কোথা থেকে অভিযোগের তীর ধেয়ে আসছে তার উপর নির্ভর করে তারা তাদের না-অতি-গৌরবাণ্বিত ঢালের উপর তিনটি ধাঁধিয়ে দেওয়া স্লোগানের কোনও একটি সেঁটে নেয়। এই স্লোগানগুলো হল: ‘ধ্রুপদী শিক্ষা’, ‘রীতিসিদ্ধ

শিক্ষা' এবং 'বিদ্যায়তনিক (আকাদেমিক) প্রশিক্ষণ'। এই তিনটিই হল বেশ চমৎকার বস্তু, কিন্তু দুঃখের কথা যে তারা অংশত স্ববিরোধিতাপূর্ণ ও অংশত পরস্পরবিরোধী। তিনটেকে গাজোয়ারি করে একসঙ্গে যুতে দিলে সেই অতিকথার দেশের হরিগল উৎপন্ন হয়, যার অর্ধেকটা হরিণ আর অর্ধেকটা ছাগল। প্রকৃত 'ধ্রুপদী শিক্ষা' এতটাই মারাত্মকভাবে দুর্লভ ও কঠিন এবং তার জন্য এতটাই জটিল মেধাবিন্যাস প্রয়োজন যে নিখাদ নির্লজ্জ বা অবোধ কোনো ব্যক্তিই দাবি করতে পারে যে 'ধ্রুপদী শিক্ষা'-র লক্ষ্যে জিমনাসিয়ামের মাধ্যমে পৌঁছানো সম্ভব হতে পারে। 'রীতিসিদ্ধ শিক্ষা' শব্দগুচ্ছটি অত্যন্ত স্থূল ও দর্শনবিরুদ্ধ যা থেকে আমাদের নিষ্কৃতি পাওয়ার চেষ্টা করা উচিত, কারণ তার বিপরীত ধারণা হিসেবে 'বস্তুসিদ্ধ শিক্ষা'-র কোনও অস্তিত্ব হয় না। শেষাবধি, যিনি 'বিদ্যায়তনিক প্রশিক্ষণ'-কেই জিমনাসিয়ামের লক্ষ্য হিসেবে তুলে ধরেন, তৎক্ষণাত তিনি 'ধ্রুপদী শিক্ষা' ও তথাকথিত 'রীতিসিদ্ধ শিক্ষা'-কে পরিত্যাগ করে বসেন এবং তার মধ্য দিয়ে জিমনাসিয়ামের গোটা শিক্ষাবিষয়ক প্রকল্পটিকেই পরিত্যাগ করেন, কারণ বিদ্যায়তনিক ঘরানার একজন মানুষ ও প্রকৃত শিক্ষিত একজন মানুষ এমন দুটি ভিন্ন পরিসরের বসিন্দা যে দুটি পরিসর কখনও কখনও পরস্পরকে ছেদ করলেও কখনওই মিলে এক হয়ে যায় না।[১৩]

"জার্মান ভাষাশিক্ষা ক্লাসে প্রকৃতপক্ষে যা ঘটে বলে আমরা দেখলাম, তার সঙ্গে মিলিয়ে দেখলে জিমনাসিয়ামের মূল লক্ষ্য বলে দাবি করা এই বস্তুত্রয়ের আসল রূপ আমাদের কাছে খোলসা হবে, আমরা দেখব যে এগুলো নেহাত মুখ রক্ষা করার বাহানা, সমালোচকদের সঙ্গে যুদ্ধে প্রতিপক্ষকে ধোঁকা দিয়ে পালানোর অছিলা। বর্তমান ভাষাশিক্ষায় এমন ছিটেফোঁটা কিছু নেই যা 'ধ্রুপদী' বলতে আমরা যে প্রাচীন মহৎ ভাষা প্রশিক্ষণের কথা বোঝাই, তার স্মৃতি বয়ে আনে। আগেই বলেছি যে জার্মান প্রবন্ধরচনার মধ্য দিয়েএমন এক রীতিসিদ্ধ শিক্ষার পাঠ হয় যা 'বিশেষ ব্যক্তিসত্বা'-র নিছক খেয়ালখুশিতে পর্যবসিত হয়, বা অন্যভাবে বললে নেহাত বিশৃঙ্খলা ও বর্বরতা উৎপন্ন করে। আর এই পাঠক্রম থেকে যে বিদ্যায়তনিক প্রশিক্ষণ উৎপন্ন হওয়ার কথা, সে প্রসঙ্গে আমি আমাদের জার্মান অধ্যাপকদের আহ্বান করব যে পক্ষপাতহীনভাবে বিচার করুন তাঁদের বিদ্যাশাখার প্রাণধারা কত ন্যূনতমই না এই জিমনাসিয়ামের প্রাথমিক বিদ্যাচর্চার কাছে ঋণী, আর কত না বেশি বিশেষ বিশেষ বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকদের ব্যক্তিত্বের কাছে ঋণী।

“সার কথা হল: জিমনাসিয়াম মাতৃভাষাকে অবহেলা করেছে এবং এখনও করে চলেছে, অথচ এই মাতৃভাষা থেকেই প্রকৃত শিক্ষার শুরু, এই মাতৃভাষাই হল হাতের কাছে তৈরি থাকা সবচেয়ে স্বাভাবিক বিষয়। এর ফলে যে কোনও ভবিষ্যৎ শিক্ষাপ্রক্রিয়ার জন্য প্রয়োজনীয় উর্বর প্রাকৃতিক ভিত্তিভূমিটাই তৈরি হয় না। কঠোর শৃঙ্খলাপরায়ন ও নান্দনিকতায় আপসহীন ভাষিক মানের দ্বারাই একমাত্র আমাদের ধ্রুপদী লেখকদের মহত্ব সম্পর্কে যথার্থ বোধ তৈরি হতে পারে, কিন্তু এখনও অবধি জিমনাসিয়ামগুলো এইসব ধ্রুপদী রচনাবলীকে প্রশংসার চোখে বিচার করেছে কেবলমাত্র কিছু ট্র্যাজেডি বা উপন্যাসের বিষয়বস্তুর নিরিখে বা বিবিধ শিক্ষকদের অনিশ্চিত নান্দনিকতাবোধের টাট্টুবিলাসের কারণে। অথচ নিজস্ব ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকেই সকলের জানা থাকার কথা যে ভাষা কী দুরূহ বস্তু; কেবলমাত্র দীর্ঘ অনুসন্ধান ও কঠোর সংগ্রামের মধ্য দিয়েই নিজের জোরে আমাদের মহান কবিদের হেঁটে যাওয়া পথের মাঝে পৌঁছানো উচিত, যদি অনুধাবন করতে হয় যে সেই মহান কবিরা কি লঘুপদ নৃত্যছন্দে এ পথে হেঁটেছেন আর তাদের অনুসরণকারী-অনুকরণকারীদের পা কীভাবে আড়ষ্টতায় কদর্য হয়ে উঠেছে।

“সেহেন কঠোর শৃঙ্খলাপরায়নতার মধ্য দিয়ে যাওয়ার পরই কেবলমাত্র আমাদের বিদ্বৎসমাজের তথাকথিত ‘পরিশুদ্ধ ভাষাশৈলী’ এবং আমাদের ঔপন্যাসিক ও সাংবাদিকতার জাবদালেখকদের লিখনশৈলীর তথাকথিত ‘কমনীয়তা’ সম্পর্কে একজন তরুণের মধ্যে যথোচিত শারীরিক বিতৃষ্ণা জাগতে পারে। তখন সেই তরুণ হাস্যকর সব দ্বিধাদ্বন্দ্বের ঘনঘোর পাক থেকে একলপ্তে মুক্তি পেয়ে যাবে; যেমন ধরা যাক, অয়েরবাখ[১৪] বা গুৎজকোও[১৫] মহান লেখক কিনা তা নিয়ে আর সে মাথা ঘামাবে না কারণ তীব্র বিতৃষ্ণাবোধ থেকে সে তাদের লেখা পড়বেই না। এই তীব্র শারীরিক বিতৃষ্ণাবোধ অবধি নিজের নান্দনিক সংবেদনশীলতাকে বিকশিত করা মোটেই সহজ কাজ নয়, কিন্তু ভাষার এই কাঁটায় মোড়া পথের মধ্য দিয়ে দুরূহ যাত্রা ব্যতীত নান্দনিক বোধ বিকশিত করার আর কোনও বিকল্প নেই। ভাষার কাঁটায় মোড়া পথ বলতে আমি ভাষিক আত্মশৃঙ্খলাকে বোঝাচ্ছি, ভাষাতত্ত্ব বোঝাচ্ছি না।

“এই ব্যাপারে আন্তরিক প্রচেষ্টা গ্রহণ করার মানে যে কঠিন পরীক্ষার মধ্য দিয়ে যাওয়া, তার সঙ্গে তুলনা হতে পারে নতুন সৈনিক হতে চাওয়া এমন কোনো প্রাপ্তবয়স্কের ঝকমারি যে এতদিন কেবল শিল্পকলা হিসেবে হাঁটার গুণকীর্তন করে আসার পর এখন নিজে পায়ে হাঁটতে শিখতে বাধ্য হচ্ছে।

মাসের পর মাস প্রাণান্তকর অভিজ্ঞতা। এতদিন ধরে বিমূর্তভাবে শেখা হাঁটার কলা মূর্তভাবে করতে গিয়ে ভয় ধরে যে পায়ের পেশী বুঝি ছিঁড়ে গেল, আনাড়ির মতো যেভাবে একটা পায়ের সামনে আরেকটা পা পড়ে তা আত্মবিশ্বাসকে নাড়িয়ে দেয়, মনে আশঙ্কা ঘনিয়ে ওঠে যে ঠিকভাবে হাঁটতে পারা আর কোনোদিনও হবে না, হাঁটা নিয়ে যতটুকু জানা আছে তাও বুঝি ভুলতে হবে। হঠাৎই তার উপলব্ধি হয় যে বিমূর্ত শিক্ষাকে অনুকরণ করে এই আনাড়ির মতো পদচালনা আসলে অভ্যাসে পরিণত হয়ে দ্বিতীয় সত্তা হয়ে উঠেছে। তখনই সে আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে পা ফেলার ক্ষমতা ফিরে পায়; আগের থেকে জোরালোভাবে, এমনকি শিল্পগুণান্বিতভাবেও, সে হাঁটতে শুরু করে। আমাদের 'কমনীয়' লেখকরা আসলে কোনোদিন হাঁটতে শেখেনি, তাদের শৈলীই তার প্রমাণ। আমাদের জিমনাসিয়ামগুলোতেও যে এই দক্ষতার শিক্ষা হয় না, আমাদের লেখকরাই তার প্রমাণ। অথচ একটি যথাযথ ভাষিক চলনভঙ্গীই হল সংস্কৃতির প্রারম্ভিক বিন্দু— আর এই শুরুটা যদি ঠিক করে হয়, তাহলে তা 'কমনীয়' লেখককূলের প্রতি সেই শারীরিক প্রতিক্রিয়া তৈরি করে যাকে আমরা 'বমনেচ্ছা' বলে থাকি।

"আমাদের জিমনাসিয়াম-ব্যবস্থা যে বিষময় ফল ফলিয়েছে তা আমরা এখন দেখতে পাচ্ছি। কর্তব্যপরায়ণতা ও অভ্যাস তৈরি যে সত্যিকারের ফাঁকিহীন শিক্ষার প্রধান বৈশিষ্ট্য, তা প্রদান করা জিমনাসিয়ামগুলোর অসাধ্য, তারা খুব বেশি হলে বিদ্বৎজনসুলভ প্রবণতাকে উৎসাহিত ও সঞ্চারিত করতে পারে। এই কারণেই আমরা এত ঘন ঘন পাণ্ডিত্যকে বর্বরতার সঙ্গে গাঁটছড়া বাঁধতে দেখছি, দেখছি যে বিদ্যাপরিষদ ও সংবাদপত্র গাঁটছড়া বেঁধে বসে আছে। গ্যেটে, শিলার, লেসিঙ ও উইঙকেলমানদের[১৬] প্রচেষ্টায় জার্মান বিদ্যাব্যবস্থা একদিন যে শিখরে পৌঁছেছিল, আজকালকার বিদ্যাচর্চাকারীরা, প্রায় ব্যতিক্রমহীনভাবে, তার থেকে দূরে সরে গেছে, বা বলা ভালো, অনেক নিচে ডুবে গেছে। এই ভয়ংকর অবনমন ফুটে বেরোয় যখন আমরা দেখি যে গেরভিনাস বা স্‌খমিড[১৭] নামক কোনো সাহিত্যের ইতিহাসকারের হাতে এইসব মহান পুরুষরা কীরকম ভুলবোঝার বলি হচ্ছে, আর 'শিক্ষিত' নারী-পুরুষদের কথোপকথনে তারই পুনরাবৃত্তি ঘটে চলেছে।

"এই অবনমনের সবচেয়ে স্পষ্ট এবং একইসঙ্গে সবচেয়ে বেদনাদায়ক প্রমাণ পাওয়া যায় জিমনাসিয়াম বিষয়ে শিক্ষাতাত্ত্বিক লেখালেখির হালহকিকত থেকে। অর্ধ শতক বা তারও বেশি সময় জুড়ে এই ধরনের লেখালেখির মধ্যে যথার্থভাবে

স্বীকৃত হওয়া তো দূরের কথা, বিন্দুমাত্র উল্লিখিতও হয়নি প্রকৃত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মহৎ মানুষরাই কেবল যে মূল্যবান ভূমিকা পালন করে থাকেন। কেবল এই মহৎ মানুষরাই ধ্রুপদী বিদ্যার অতীন্দ্রিয় তত্ত্বের দিশারী শিক্ষক ও পথপ্রদর্শক হিসেবে পুরাকালীন সর্বোৎকৃষ্টতায় ফিরে যাওয়ার রাস্তা করে দিতে পারে। তথাকথিত ধ্রুপদী শিক্ষার এক এবং একমাত্র স্বাভাবিক ও স্বাস্থ্যকর প্রারম্ভবিন্দু হল মাতৃভাষা ব্যবহারে নান্দনিকতায় আন্তরিক ও অধ্যবসায়ী প্রশিক্ষণ। প্রায় কেউই এই পথ ও গূঢ়ছাঁদকে নিজের ভিতর থেকে একা খুঁজে নিতে পারে না; মহৎ পথপ্রদর্শক ও শিক্ষকদের প্রয়োজন হয় এবং সেই শিক্ষকদের দেওয়া আশ্রয়ের উপর ভরসা রাখতে হয়। এই ছাঁদ সম্পর্কে বোধ পূর্ণ বিকশিত না হওয়া অবধি ধ্রুপদী শিক্ষা বা সংস্কৃতি বিকাশের জমি তৈরি হয় না। সুছাঁদ ও জঞ্জালের মধ্যে পার্থক্য করতে পারার এই বোধের উন্মেষের মধ্য দিয়েই প্রথম কেঁপে ওঠে সেই ডানা যা পাখা মেলে আমাদের উড়িয়ে নিয়ে যেতে পারে গ্রিক পুরাকালের অলিন্দে সংস্কৃতির সেই একমেবাদ্বিতীয়ম আদিবাসায়। দূর, বহু দূর, অসীম দূরত্বের সেই হীরকপ্রাচীরে ঘেরা হেলেনিয় সংস্কৃতির দুর্গে পৌঁছানোর প্রয়াসে অবশ্য কেবলমাত্র এই ডানা আমাদের বেশি দূর অবধি নিয়ে যেতে পারে না। তখন আমাদের প্রয়োজন এই পথপ্রদর্শকদের, এই শিক্ষকদের, আমাদের ধ্রুপদী জার্মান লেখকদের, যাতে তাদের পুরাকাল-অনুসন্ধানী উড়ানের পক্ষসঞ্চালনে ভর করে আমরাও গ্রিসের গভীরতম বাসনার ভূমির দিকে যাত্রা করতে পারি।[১৮]

"বলা বাহুল্য যে ধ্রুপদী জার্মান লেখক ও ধ্রুপদী শিক্ষার মধ্যেকার এই অবশ্যগ্রাহ্য সম্পর্কের কথা আমাদের জিমনাসিয়ামগুলোর মান্ধাতার আমলের দেওয়াল ভেদ করে কণামাত্রও প্রবেশ করতে পারেনি। বরং আমাদের ভাষাতত্ত্ববিদরা আমাদের ধ্রুপদী জার্মান লেখকদের কোনও সাহায্য না নিয়েই অক্লান্তভাবে হোমার ও সোফোক্লিসকে তরুণ মনের সামনে হাজির করার চেষ্টা করে যাচ্ছে আর সেই পণ্ডশ্রমের নাম দিয়েছে 'ধ্রুপদী শিক্ষা'— এই নাম ফলিয়ে ভাবের ঘরে চুরি নিয়েও আজকাল আর কেউ কিছু বলে না। আমাদের প্রত্যেকের নিজেদের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার দিকে তাকানো যাক আর বিচার করা যাক কতটুকু হোমার ও সোফোক্লিস এই ক্লান্তিহীন শিক্ষকদের শিক্ষকতা আমাদের দিতে পেরেছে। দেখব যে আমরা এখানে সবচেয়ে প্রচলিত অথচ সবচেয়ে শক্তিমান বিভ্রান্তি কবলে পড়ে আছি, অসচেতনভাবে ছড়ানো ভুলবোঝাবুঝির পাকে জড়িয়ে আছি। কোনও জার্মান জিমনাসিয়ামের অভ্যন্তরে আমি একগাছি হালকা পলকা সুতোও খুঁজে পাইনি যাকে সত্যিই 'ধ্রুপদী শিক্ষা'

বলা যেতে পারে— আর তাতে বিস্মিত হওয়ার অবকাশই বা কোথায়— যেভাবে জিমনাসিয়াম জার্মান ধ্রুপদী সাহিত্য এবং জার্মান ভাষা প্রশিক্ষণকে ব্রাত্য করে রেখেছে, তাতে এটাই তো হওয়ার কথা। শূন্যের মধ্যে অন্ধভাবে ঝাঁপ দিয়ে পুরাকালীন সর্বোৎকৃষ্টতায় পৌঁছানো যায় না, অথচ আমাদের ভাষাতত্ত্ববিদ শিক্ষকদের করা রাশভারী সারসংক্ষেপ বা টীকাটিপ্পনীসমূহ কেবল ওই অন্ধভাবে শূন্যে ঝাঁপ ছাড়া আর কিছুই নয়।

"নান্দনিক মেধার সঙ্গে অতীব পরিশ্রমসাধ্য শিক্ষার্জনের সংগ্রাম সমন্বিত হয়ে ধ্রুপদী হেলেনিয় সংস্কৃতি নিয়ে বোধের উন্মেষ এত দুর্লভ একটি ফলাফল যে জিমনাসিয়ামগুলোর তা জাগ্রত করার দাবি কেবলমাত্র বর্বর ভ্রান্তিবিলাস ছাড়া আর কিছুই নয়। আর কোন বয়সের মানুষদের মধ্যে জাগানোর কথা বলা হচ্ছে? এমন কাঁচা বয়সে যখন হালফিলের সবচেয়ে জাঁকালো অথচ সবচেয়ে রুচিহীন ফ্যাশনই অন্ধভাবে নাকে দড়ি দিয়ে ঘোরায়, যে বয়সে এই বোধের কণামাত্রও জন্মায় না যে এই হেলেনিয় সংস্কৃতি নিয়ে আবেগ জাগলে তা বর্তমানের তথাকথিত সংস্কৃতির বিরুদ্ধে অবিরাম সংগ্রামের মধ্য দিয়েই কেবল প্রকাশিত হতে পারে। আজকালকার জিমনাসিয়ামের শিক্ষার্থীদের কাছে গ্রিকরা মৃতবস্তু: হোমারকে তার ভালো লাগতে পারে, অথচ স্পিয়েলহাগেনের[১৯] কোনও নভেল তাকে ঢের বেশি উজ্জীবিত করে; গ্রিক ট্র্যাজেডি বা কমেডি সে হাস্যমুখেই গলাধঃকরণ করতে পারে কিন্তু ফ্রেতাগের 'জার্নালিস্টস'-য়ের[২০] মতো নাটক তাকে ভিতর থেকে নাড়া দেয়। প্রাচীন লেখকদের সম্পর্কে তার মনোভাব অনেকটা সেই নন্দনতাত্ত্বিক হেরমান গ্রিম[২১]-য়ের মতো যে একবার ভেনাস ডি মিলো-কে নিয়ে লেখা একটা কুণ্ডলী-পাকানো প্রবন্ধে শেষাবধি বিলাপ করেছিলেন: 'এই ধরনের দেবী নিয়ে আমার কী আসে যায়? যে চিন্তাসূত্র তারা জাগ্রত করে সেসব আমার কী কাজে লাগবে? ওরেস্তেস ও ঈদিপাস, ইফিজেনিয়া ও আন্তিগোনে[২২]— আমার মনের সঙ্গে তাদের মিল কোথায়?' — না হে জিমনাসিয়ামের শিক্ষার্থীদল, ভেনাস ডি মিলো-র সঙ্গে তোমাদের কোনও সম্পর্ক নেই, আর তোমাদের শিক্ষককুলেরও ততোধিকই কোনও সম্পর্ক নেই!

"এই হল আমাদের আজকের জিমনাসিয়ামের করুণ নিয়তি। তাকে গোপন করে রাখা হয়েছে। সংস্কৃতির আদিদেশে কে তোমাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবে যখন তোমাদের পথপ্রদর্শকরা দৃষ্টিহীন হয়েও দূরদৃষ্টিসম্পন্ন হওয়ার ভান করে থাকে! চারুকলার পবিত্র সংকল্পবদ্ধতা ও আন্তরিকতা সম্পর্কে প্রকৃত বোধ তোমাদের মধ্যে কেউ কীভাবে অর্জন করবে য়খন তোমাদের এমনসব পদ্ধতি-

প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে নষ্ট করা হচ্ছে যেসব পদ্ধতি-প্রক্রিয়া তোমাদের কথা বলতে শেখানোর পরিবর্তে নিজেদের মতো করে তুতলে যাওয়াতেই উৎসাহিত করছে, চারুকলার কাজকে সশ্রদ্ধ পুজো করার পরিবর্তে নিজে থেকে সুন্দরকে খুঁজে নিতে বলছে, মহান চিন্তাকারীদের কথার প্রতি ধ্যান দিতে বাধ্য করার পরিবর্তে নিজেদেরই দার্শনিকের মতো আচরণ করতে উসকে দিচ্ছে। এই সবের ফলস্বরূপ তোমরা চিরকাল বর্তমানের দাসানুদাসে পরিণত হয়ে পুরাকালের থেকে দূরে থেকে যাবে।

"এতদসত্ত্বেও, আমাদের আজকের পরিচিত জিমনাসিয়ামগুলোর সবচেয়ে উপকারী দিকটা হল এই যে এগুলোয় গ্রিক ও লাতিন ভাষার উপর টানা বেশ কয়েক বছর গুরুত্ব দেওয়া হয়ে থাকে। শিক্ষার্থীরা ব্যাকরণ ও অভিধানকে সম্মান দিতে শেখে, নিয়মাবদ্ধ ভাষারূপকে সম্মান দিতে শেখে, ভুলকে ভুল বলে গণ্য করতে শেখে। আজকালকার জার্মান ভাষাশৈলীতে যেমন ব্যাকরণ ও বানানের যেকোনো খামখেয়াল ও বিধিভঙ্গকেই ন্যায়সঙ্গত বলে দাবি করা হয়, তার সামনে হতদ্যম না হয়ে পড়ার শক্তি জোগায়। কেবল যদি ভাষার প্রতি এই সম্মানবোধ ত্রিশঙ্কু অবস্থায় ভাসমান অপ্রয়োজনীয় তাত্ত্বিক বোঝা না হয়ে থাকত! মাতৃভাষায় ফেরার সঙ্গে সঙ্গে এই সম্মানবোধ যদি উবে না যেত! কিন্তু লাতিন ও গ্রিক ভাষার শিক্ষকরা সাধারণত তাদের মাতৃভাষা নিয়ে মাথা ঘামায় না; শুরু থেকেই তারা জার্মান ভাষাকে মনে করে হাত-পা ছড়িয়ে যেমন খুশি করার একটা ক্ষেত্র, লাতিন ও গ্রিকে কঠোর শৃঙ্খলায় বাঁধা থাকার পর যেখানে এসে খানিক বিশ্রাম নেওয়া যায়। ফলে জার্মান ভাষা অলস খামখেয়ালের ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়— অবশ্য জার্মানরা তো তাদের সমস্ত দেশীয় বস্তুকেই এভাবে দেখতে অভ্যস্ত হয়ে উঠেছে! এক ভাষা থেকে অন্য ভাষায় অনুবাদের যে চমৎকার অনুশীলন নিজের ভাষা সম্পর্কে নান্দনিক বোধ জাগ্রত করায় এত উপযোগী, সেই অনুশীলনও যথোপযুক্ত অধ্যবসায় ও সম্ভ্রমের সঙ্গে জার্মান চর্চায় নিয়োগ করা হয় না; অথচ যে বিশৃঙ্খল অবস্থায় জার্মান ভাষা পতিত হয়েছে, সেখানে তার প্রয়োজনই ছিল সবচেয়ে বেশি। এই অনুবাদের অনুশীলনই ক্রমশ কমে আসছে: ধ্রুপদী ভাষা বুঝতে পারাই যথেষ্ট বোধ করা হচ্ছে, সে ভাষায় কথা বলার সামর্থ্য নিয়ে আর কেউ মাথা ঘামাচ্ছে না।

"আগেকার দিনে জিমনাসিয়ামগুলো ধ্রুপদী সাহিত্য বিষয়ক পাঠ দেওয়ার আন্তরিক চেষ্টা করত, অথচ তার সম্পূর্ণ বিপরীতে গিয়ে জিমনাসিয়ামগুলোকে এখন পণ্ডিতিচর্চার ক্ষেত্র হিসেবে দেখার প্রবণতা প্রকট হয়ে উঠছে।[২৩] সে ছিল

আমাদের মহান কবিদের যুগ, গুটিকয় যে প্রকৃত সংস্কৃতিবান জার্মান এতাবধি আমাদের দেশে জন্মেছে তাদের যুগ। প্রাচীন গ্রিস ও রোমের মানুষদের মধ্য থেকে প্রবাহিত ধ্রুপদ ধারাকে নবরূপে জিমনাসিয়ামগুলোর মধ্য দিয়ে বইয়ে দিয়েছিলেন মহান ফ্রিয়েদরিশ অগস্ট উল্ফ। তাঁর করা সেই সাহসী সূত্রপাত জিমনাসিয়ামগুলোকে নতুন রূপ দান করেছিল— বিদ্যায়তনিক গবেষণাপত্র চালানোর আঁতুড়ঘর হয়ে না থেকে সেগুলো হয়ে উঠেছিল উচ্চতর ও উদারচেতা শিক্ষার জন্য নিবেদিত প্রকৃত পবিত্র স্থান।[২৪]

"বাইরে থেকে বেশ কিছু সংস্কার প্রয়োগ করা জিমনাসিয়ামকে আধুনিক রূপ দেওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় বোধ হয়েছিল, এবং এমন কিছু গুরুত্বপূর্ণ সংস্কার সফলভাবে প্রযুক্তও হয়েছিল। তাদের দীর্ঘস্থায়ী প্রভাবও পড়েছিল। কিন্তু যা ছিল সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সেটাই ঘটেনি: স্বয়ং শিক্ষকদের এই নতুন বোধে দীক্ষিত করে তোলা যায়নি। তারই ফলস্বরূপ জিমনাসিয়াম শিক্ষা আজকে উল্ফ-প্রবর্তিত ধ্রুপদী সাহিত্য বিষয়ক পাঠ দেওয়ার আদর্শ ছেড়ে বহু দূরে সরে গেছে। পাণ্ডিত্য ও প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার উপর চরম মূল্য আরোপ করা বিধেয় হয়েছে— উল্ফ নিজেও এই প্রবণতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে একে পরাস্ত করেছিলেন, কিন্তু আবার তা দাপটের সঙ্গে ফিরে এসেছে, দীর্ঘ ক্লান্তিকর লড়াইয়ের মধ্য দিয়ে উল্ফ-প্রবর্তিত শিক্ষাদর্শকে অপসারণ করে পণ্ডিতিচর্চাকেই একমাত্র মান্যবরের আসনে বসিয়েছে, যদিবা আগের মতো খোলাখুলি না হয় তাহলে লুকিয়ে মুখ ঢেকে তা করেছে। তাছাড়া, এহেন শিক্ষা-উদ্যোগের অ-জার্মান, বিদেশিপ্রায় বা সার্বভৌমিক চরিত্র; এহেন বিশ্বাস যে আমাদের পায়ের নিচ থেকে আমাদের দেশের মাটিকে সরিয়ে দেওয়ার পরও আমরা খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে পারব; পাগলের মতো এই চিন্তা যে আমাদের জাতীয় জার্মান চারিত্র্যকে অস্বীকার করে ফেলতে পারলেই আমরা সটান দূর হেলেনিয় জগতে লম্ফ দিয়ে উপস্থিত হতে পারব— এইসবই জিমনাসিয়ামগুলোর ধ্রুপদী শিক্ষার মহৎ পথ অবলম্বন অসম্ভব করে তুলেছে।

"সত্যটি অবশ্যই হল এই যে আমাদের জানতে হবে কীভাবে এই জার্মান চারিত্র্যকে চিনে নিতে হয়, তা সে জঞ্জালের ঢিপির নিচেই চাপা পড়ে থাকুক বা অত্যাধুনিক বেশভূষায় ঢাকা পড়ে থাকুক, তার টুকরো অবশেষটুকু নিয়েও যাতে আমরা লজ্জিত না বোধ করি ততটাই তাকে ভালোবাসতে হবে, আর সর্বোপরি 'সমকালীন জার্মান সংস্কৃতি'-র নামে এখন যা দাপিয়ে বেড়াচ্ছে তার সঙ্গে যেন গুলিয়ে না ফেলি। আত্মগতভাবেই জার্মান চারিত্র্য এই দাপিয়ে বেড়ানো

'সমকালীন সংস্কৃতি'-র সম্পূর্ণ বিপরীত। এই জার্মান চারিত্র্য রুক্ষ বহিরঙ্গ নিয়ে হলেও মূলত টিকে আছে সেই সব পরিসরে যে পরিসরগুলোর সংস্কৃতিহীনতা নিয়ে 'বর্তমান সময়'-য়ের অভিযোগের অন্ত নেই। আর অন্যপক্ষে, 'জার্মান সংস্কৃতি'-র নামে আজ যা চলছে তা এক সার্বভৌমত্ববাদী জগাখিচুড়ি ছাড়া আর কিছু নয়। শিলারের তুলনায় একজন সাংবাদিক যা, বেটোফেনের তুলনায় মেয়েরবিয়ার[২৫] যা, জার্মান চারিত্র্যের তুলনায় এই জগাখিচুড়িও তাই। এই 'সংস্কৃতি' ফ্রান্সের সংস্কৃতি দ্বারা সবচেয়ে বেশি প্রভাবিত। ফ্রান্সের এই সংস্কৃতি তার সবচেয়ে গভীর সবচেয়ে মৌলিক প্রকৃতির বিচারে সবচেয়ে বেশি অ-জার্মানসুলভ, অথচ আমার জার্মানরা মেধাহীনভাবে রুচিহীনভাবে তাকেই অক্ষম অনুকরণ করে চলেছি। এহেন অনুকরণ জার্মান সমাজ, গণমাধ্যম, চারুকলা ও শৈলীকে এক মিথ্যা কপটাচারী আকার দিয়েছে। রোমানদের সারবস্তু থেকে জৈবপ্রক্রিয়ায় উদ্ভূত একটি সভ্যতা বর্তমান অবধি তার যে অর্জনপথ জারি রেখেছে, তার শৈল্পিক উৎকর্ষ যে কখনও কোনও অনুকরণের মধ্য দিয়ে অর্জন করা যায় না তা বলাই বাহুল্য। অনুকরণ ও সহজ প্রবৃত্তির মধ্যে এই বৈপরীত্যকে বুঝতে আমাদের সবচেয়ে খ্যাতিমান জার্মান ঔপন্যাসিকের সঙ্গে ফরাসি বা ইতালিয় এমনকি অখ্যাত কোনও ঔপন্যাসিকের তুলনা টানাই যথেষ্ট। উভয়পক্ষই একইরকম সন্দিগ্ধ প্রবণতা ও অভিপ্রায় এবং আরও একইরকম অনিশ্চয়তাপূর্ণ উপায় ধারণ করে আছে। অথচ ফরাসি ও ইতালিয় ঔপন্যাসিকদের মধ্যে আমরা শৈল্পিক গুরুগাম্ভীর্য, অন্ততপক্ষে ভাষার শুদ্ধতা পাই, প্রায়শই যার সঙ্গে যুক্ত হয়ে আসে প্রকৃত সৌন্দর্য এবং সংশ্লিষ্ট সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিস্থিতির সঙ্গে আগাগোড়া সমতানীয় সম্পৃক্তি। আর এই জার্মানিতে সবকিছুই মৌলিকতাহীন, স্থূল, মেদবহুল, চিন্তা ও প্রকাশভঙ্গির জীর্ণ আটপৌরে পোষাকে বিরক্তিকরভাবে এলিয়ে পড়ে আছে, কোনও প্রকৃত সামাজিক পরিপ্রেক্ষিতময়তার কথা তো বাদই দাও। এখানকার বিদ্যায়তনিক পণ্ডিতি বোলচালের প্রদর্শনী মনে করিয়ে দেয় যে জার্মানিতে অসফল পণ্ডিতরাই লেখক-সাংবাদিক হয়ে বসে, আর লাতিন দেশগুলোয় শিল্পরুচিসম্পন্ন সংস্কৃতিমনস্ক ব্যক্তিরাই লেখক-সাংবাদিক হয়। এই তথাকথিত জার্মান নামধারী অথচ অনুকরণসর্বস্ব সংস্কৃতি নিয়ে জার্মানদের মাথা উঁচু করে দাঁড়ানোর কোনও আশা নেই, ফরাসি ও ইতালিয়রা সবসময়েই তাকে লজ্জায় ফেলবে, আর বিদেশি সংস্কৃতিকে চতুরভাবে অনুকরণ করার দক্ষতার কথাও যদি ধরা হয়, সেখানেও রুশরা তাকে টপকে যাবে।

“সেইজন্যই আরো জোরের সঙ্গে আমি সেই জার্মান স্ব-চারিত্র্যকে আঁকড়ে ধরতে চাই যা জার্মান পুনর্গঠন[২৬] ও জার্মান সঙ্গীতের মধ্য দিয়ে প্রকাশিত হয়েছিল, এবং যা জার্মান দর্শনের সাহসিকতা ও দৃঢ়তার মধ্য দিয়ে, জার্মান সৈনিকদের সম্প্রতি পরীক্ষিত আনুগত্যের মধ্য দিয়ে[২৭] সমস্ত ভ্রান্ত বাহ্যাড়ম্বরের বিপরীতে নিজের শক্তির স্থায়ীত্বের প্রমাণ দিয়েছে। এই চারিত্র্যের জোরেই আমরাও ‘আজকের দিনের’ কেতাদুরস্ত ছদ্মসংস্কৃতিকে ঘায়েল করতে পারি। আমি আশা করি যে ভবিষ্যতে স্কুলগুলো প্রকৃত সংস্কৃতিকে অবলম্বন করে এই যুদ্ধে নামবে, আর বিশেষ করে জিমনাসিয়ামগুলোয় তরুণতর প্রজন্মদের মধ্যে প্রকৃত জার্মান সত্তা সম্পর্কে আবেগ প্রজ্জ্বলিত করে তোলা হবে। তা করার মধ্য দিয়ে স্কুলগুলো অবশেষে তথাকথিত ধ্রুপদী শিক্ষাকে তার স্বাভাবিক ভিত্তির উপর স্থাপন করে সম্ভাব্য একমাত্র প্রারম্ভবিন্দু থেকে তার সূচনা ঘটাবে। জিমনাসিয়ামগুলোর প্রকৃত শুদ্ধিকরণ ও নবায়ন জার্মান চারিত্র্যের গভীর ও চরম শুদ্ধিকরণ ও নবায়নের থেকেই একমাত্র উৎসারিত হতে পারে।

“জার্মান চারিত্র্যের গহনতম সার এবং গ্রিকদের জিনিয়াসের মধ্যে যোগসূত্রটি অতি রহস্যময়, উপলব্ধি করাও অতি কঠিন। কিন্তু যতক্ষণ না প্রকৃত জার্মান চারিত্র্য তার গভীরতম সর্বোত্তম চাহিদা নিয়ে গ্রিক জিনিয়াসের পরিত্রাণকারী হাত ধরার জন্য নিজে থেকে হাত বাড়াবে, বর্বরতার উত্তাল নদী পার হওয়ার জন্য শক্ত মুঠিতে সেই পরিত্রাণকারী হাত আঁকড়ে ধরতে চাইবে, যতক্ষণ না গ্রিক সারের জন্য এক সর্বগ্রাসী ক্ষুধা জার্মান চারিত্র্যকে তাড়িত করবে, যতক্ষণ না বহু পরিশ্রমে উপলব্ধ দূর থেকে দেখা গ্রিক আদিভূমির এক ঝলক যা দিয়ে গ্যেটে ও শিলার তাঁদের সত্তাকে পুনরুজ্জীবিত করেছিলেন তা আমাদের মধ্যেকার সবচেয়ে মেধাবী ও সর্বোত্তমদেরও তীর্থক্ষেত্র হয়ে উঠছে— ততক্ষণ অবধি আমাদের জিমনাসিয়ামগুলোর ধ্রুপদী শিক্ষা দেওয়ার ঘোষিত লক্ষ্য নিরালম্বভাবে শূন্যে মাথা কুটে মরবে। আর ততদিন অবধি জিমনাসিয়ামগুলোর মধ্যে যারা বিদ্যায়তনিক পরিধির শত সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও তাদের ছাত্রছাত্রীদের ‘সংস্কৃতি’ ও ‘শিক্ষা’-র ভেক ধরে চলা চোখ-ধাঁধানো মায়াবী প্রলোভনগুলো থেকে রক্ষা করতে অন্তত একটি হলেও কোনও একটি দৃঢ় প্রকৃত আদর্শকে লক্ষ্য করে জ্ঞানচর্চাকে পুষ্টি যোগাতে চায়, তাদেরও বিফলতার জন্য নিজেদের দোষ দেওয়ার কোনও মানে হয় না। এহেন দুঃখজনক অবস্থায় আজ জিমনাসিয়ামগুলো পড়ে আছে: সেখানে এখন সবচেয়ে সংকীর্ণ সবচেয়ে সীমাবদ্ধ দৃষ্টিকোণগুলোই সঠিকতার মুকুট পড়ে রাজ করছে কারণ যে অবস্থান

থেকে এগুলোকে ভুল বলে বোঝা যায়, সেই অবস্থানে পৌঁছানো বা এমনকি দূর থেকে সে অবস্থানের দিকে নির্দেশ করার মতো লোকও এখন কেউ নেই।”

“একজনও কেউ নেই?” দার্শনিকের ছাত্র প্রশ্ন করল, আবেগে তার গলা কেঁপে গেল। তারপর দুজনই স্তব্ধ হয়ে রইলেন।...

...বেশ কিছুক্ষণ দুজন নীরবে নিজেদের মনে ভাবার পর তরুণজন সেই নীরবতা ভাঙল। বৃদ্ধ দার্শনিকের দিকে ফিরে সে বলল, “গুরুদেব, আপনি আমাকে সান্ত্বনা দিতে চেয়েছেন, আর আপনি আমাকে আরও বেশি অন্তর্দৃষ্টি দিয়েছেন, তার মধ্য দিয়ে আমাকে সাহস ও জোর জুগিয়েছেন। সত্যিই আমি এখন আরো সাহস নিয়ে যুদ্ধক্ষেত্রের দিকে তাকাতে পারছি আর আমার অতি দ্রুত পলায়নপরতাকে এখন নিজেই তিরস্কার করতে পারছি। আমরা কেবল নিজেদের জন্য এই লড়াই লড়ছি না। একথা ভেবে আমাদের কাতর হওয়া সাজে না যে কতজনকে এই লড়াইয়ের বলি হতে হবে, বা আমরা নিজেরাই এর প্রথম বলি হব কি না। যেহেতু আমরা লড়াইয়ের ব্রত গ্রহণ করেছি, দুর্ভাগা ব্যক্তিবিশেষের জন্য চিন্তাকে প্রশ্রয় দেওয়া উচিত হবে না; যখনই কোনো যোদ্ধা ভূলুন্ঠিত হবে, সেই মুহূর্তেই তার হাতের নিশান অন্য কেউ তুলে নিয়ে এগিয়ে যাবে। এই লড়াইয়ের জন্য শক্তি আমার আছে কিনা, শেষ অবধি আমি টিকে থাকতে পারব কিনা, এসব আর এখন আমায় চিন্তিত করছে না। যুদ্ধক্ষেত্রে শত্রুর বিদ্রূপ ও পরিহাস মেশানো হাসির নিচে লুটিয়ে পড়াও এক সম্মানজনক মৃত্যু হতে পারে, যেহেতু তাদের আন্তরিকতাও কতবারই না আমাদের কাছে হাস্যকর ঠেকেছে। আমি এবং আমার প্রজন্মের অন্যরা যেভাবে নিজেদের একইরকম পেশাদার জীবনের সাফল্যের জন্য প্রস্তুতি নিয়েছিলাম, শিক্ষকের জন্য সর্বোচ্চসম্ভব পদটির দিকে নিশানা করেছিলাম, এখন যখন তা ভাবি, তখন উপলব্ধি করি যে ঠিক তার বিপরীত বিষয়গুলোকে আমরা কতই না পরিহাস করতাম আর তাছাড়াও একদম আলাদা বিষয়গুলো নিয়েও আন্তরিক ছিলাম—”

“আরে দাঁড়াও, দাঁড়াও, প্রিয় বন্ধু”, দার্শনিক হেসে উঠে তাঁর তরুণ সঙ্গীর কথার মাঝেই বলে উঠলেন, “তুমি তো এমনভাবে কথা বলছ যেন সাঁতার কাটতে না জেনেও গভীর জলে ঝাঁপিয়ে পড়তে চাও, ডুবে মরার ভয় যত না তোমায় তাড়া করছে, তার থেকে বেশি তাড়া করছে ডুবে মরতে না পারার জন্য পরিহাসের ভয়। কিন্তু সবচেয়ে আগে আমাদের পরিহাসের ভয়কেই ত্যাগ করতে হবে। এ বিষয়ে কতগুলো সত্য আমাদের বলতে হবে, আর সেই সত্যগুলো এতই ভীতিপ্রদ, লজ্জাকর ও অমার্জনীয় যে আমাদের এমন শত্রুর

অভাব হবে না যারা অতি আন্তরিকভাবেই আমাদের ঘৃণা করবে আর তাদের ক্রোধই মাঝেমধ্যে লজ্জাকে আড়াল করা পরিহাস হিসেবে উৎক্ষিপ্ত হবে। শুধু সেই অগণিত শিক্ষকের পালের কথা ভাবো যারা বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থার অস্তিত্বের সঙ্গে নিজেদের ভাগ্যকে যুতে ফেলেছে এবং তাই হাসিমুখে চিন্তাহীনভাবে এই ব্যবস্থাকেই জারি রেখে যেতে চায়। কী আচরণ তারা করবে বলে তোমার মনে হয় যখন তারা এমন পরিকল্পনার কথা শুনবে যেখানে স্বভাবগত কারণেই তারা টিকতে পারবে না, বা যার দাবি তাদের মধ্যমেধা পূরণ করতে পারবে না, যেখানে উচ্চারিত আশা তাদের মনে কোনও প্রতিধ্বনি তুলবে না, বা যার রণহুঙ্কারের কোনও অর্থই তারা ধরতে পারবে না, আর তাই এক বাধাসূচক জড়পিণ্ড ছাড়া অন্য কোনও ভূমিকাই তাদের পালন করার থাকবে না?

"উচ্চশিক্ষার প্রতিষ্ঠানগুলোর শিক্ষকরা কীভাবে আজকের অবস্থানে পৌঁছেছেন, কীভাবে তাঁরা উচ্চতর বিদ্যার শিক্ষক হয়েছেন তা খেয়ালে রাখলে বিস্মিত হবার কিছু নেই যে তাঁদের বিপুল গরিষ্ঠভাগই এই বাধাসূচক জড়পিণ্ডের ভূমিকা পালন করবেন। উচ্চশিক্ষার প্রতিষ্ঠান সর্বত্র ব্যাঙের ছাতার মতো এত বিপুল সংখ্যায় গজিয়ে উঠেছে যে সর্বক্ষণই সেখানে পড়ানোর জন্য আরো বেশি বেশি সংখ্যায় শিক্ষকের দরকার পড়ছে। অনবরত এত বিপুল সংখ্যক শিক্ষক কোনও জনগোষ্ঠী— এমনকি প্রতিভাস্ফূরণে সবচেয়ে অমিতব্যয়ী জনগোষ্ঠীও —কখনও তৈরি করে যেতে পারে না। এর ফলে বড্ড বেশি এমন লোক এসে ভিড় করে শিক্ষকতার পেশায় যাদের এ বিষয়ে কোনও প্রকৃত ঝোঁক বা উৎসাহ নেই। আর তারপর চোরে চোরে মাসতুতো ভাই হয়ে নিজেদের সংখ্যাধিক্য দিয়ে তারা প্রতিষ্ঠানগুলোর পরিবেশকে নিয়ন্ত্রণ করতে থাকে। শিক্ষাতত্ত্ব নিয়ে কণামাত্র বোঝাবুঝি যার নেই কেবল তেমন কোনো জনই এমনটা বিশ্বাস করতে পারে যে আমাদের জিমনাসিয়াম ও শিক্ষককুলের অতি অতিরিক্ত পরিমাণকে সংখ্যায় না কমিয়ে কেবলমাত্র কিছু নিয়ম বা নীতি আরোপ করার মধ্য দিয়েই কোনওএকভাবে মেদাধিক্যের রূপান্তর ঘটিয়ে গুণের আধিক্যে পরিণত করা যাবে। না, কখনোই তা যাবে না। দ্বিধাহীনভাবে সমস্বরে আমাদের ঘোষণা করতে হবে যে স্বভাবগতভাবে শিক্ষাচর্চার পথের জন্য উপযুক্ত ব্যক্তির সংখ্যা অত্যন্ত কম ও বিরল, আর আজকের থেকে অনেক কম সংখ্যক উচ্চশিক্ষার প্রতিষ্ঠানই সেইসব বিরল ব্যক্তিদের সফলভাবে বিকশিত হতে দেওয়ার পরিসরের জন্য যথেষ্ট। সর্বজনের মুখ চেয়ে তৈরি বর্তমানের

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোয় প্রকৃত হকদার এই বিরল ব্যক্তিরাই সবচেয়ে কম সাহায্য পেয়ে থাকে।

"একই কথা সত্য শিক্ষকদের ক্ষেত্রে। তাঁদের মধ্যে সেরা যাঁরা— উচ্চতর মানের মাপকাঠিতে যাঁরা এই সম্মানজনক পদটির জন্য প্রকৃতই যোগ্য— তাঁরাই আজকের জিমনাসিয়ামগুলোতে জড়ো করা শিক্ষাচর্চা অনুশীলনের অযোগ্য তরুণদের শিক্ষিত করে তোলার কাজে সম্ভবত সবচেয়ে বেশি বেমানান। প্রকৃতপক্ষে, এই শিক্ষকদের সর্বোত্তম যা দেওয়ার আছে সেটাই তাঁদের এহেন শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে কোনো না কোনো ভাবে আড়াল করে রাখতে হয়। অন্যদিকে, এঁদের বাদ দিয়ে বাকি বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ শিক্ষকরা এই ব্যবস্থায় সম্পূর্ণ সচ্ছন্দ বোধ করেন কারণ শিক্ষার্থীদের অপর্যাপ্ত মান ও নিচু স্তর তাঁদের নিজেদের সীমাবদ্ধ সামর্থ্যের সঙ্গে খাপ খেয়ে গিয়ে এক ধরনের সুসঙ্গতি তৈরি করে। এই সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশই আরও আরও জিমনাসিয়াম এবং উচ্চশিক্ষার প্রতিষ্ঠান খোলার জন্য প্রতিধ্বনিমুখর দাবি তোলে।

"সন্দেহ নেই যে আমরা এমন এক যুগে বাস করি যেখানে শিক্ষার জন্য অবিরাম অস্থিরচিত্ত ভ্যাবাচ্যাকা-লাগিয়ে-দেওয়া হাঁকডাকগুলো এমন এক ভান তৈরি করে যেনবা সাংস্কৃতিক প্রয়োজনের কোনো চাতক-পিপাসা নিবারণের উপক্রম হচ্ছে। কিন্তু এখানেই কানের যথাযথ ব্যবহার শিখতে হবে— শিক্ষা নিয়ে এইসব স্লোগানের গগনবিদারী হট্টগোলে দিকভ্রান্ত হলে চলবে না, বরং, যুগের সাংস্কৃতিক প্রয়োজন নিয়ে ক্লান্তিহীন বকরবকর যারা করে যাচ্ছে সোজসাপটাভাবে তাদের কথা খুঁটিয়ে বিচার করতে হবে। আর তা করলেই এক অদ্ভুত হতাশা ঘিরে ধরবে, যেমনটা আমাদের প্রায়শই অভিজ্ঞতা হয়েছে। সংস্কৃতির প্রয়োজন নিয়ে গলা ফাটানো এই অগ্রদূত ঘোষকদের একটু কাছ থেকে খুঁটিয়ে বিচার করলেই বেরিয়ে আসে তাঁদের সেই অত্যুৎসাহী প্রায় ধর্মোন্মত্ত চরিত্র যা প্রকৃত সংস্কৃতির ঘোর শত্রু, যে প্রকৃত সংস্কৃতির প্রধান অবলম্বন হল চারিত্র্যের আভিজাত্য। তাদের মৌলিক লক্ষ্য হল মহান ব্যক্তিদের শাসন থেকে জনগণকে মুক্ত করা। জিনিয়াসের রাজদণ্ডের প্রতি জনসধারণের প্রবৃত্তিগত অনুরাগ-আনুগত্য, বিনীত বাধ্যতা ও কর্তব্যপালন: বুদ্ধিবৃত্তির সাম্রাজ্যের এই অতি পবিত্র নীতিপদ্ধতিসমূহকে উপড়ে ফেলার মানসেই তারা কাজ করছে।

"তথাকথিত 'জনশিক্ষা' বলে যা বোঝানো হয়ে থাকে, দীর্ঘদিন হয়ে গেল আমি তার প্রস্তাবকদের খুঁটিয়ে দেখতে অভ্যস্ত হয়ে উঠেছি।[২৮] অধিকাংশ

ক্ষেত্রেই এই প্রস্তাবকরা সচেতন বা অসচেতন ভাবে যা চান তা বর্বরতার এক সার্বজনীন উন্মত্ত মহোৎসবে নিজেদের জন্য অবাধ স্বাধীনতা ছাড়া আর কিছু নয়। কিন্তু পবিত্র প্রাকৃতিক নীতিপদ্ধতি কিছুতেই এই স্বাধীনতা তাদের অর্পণ করবে না: হুকুম মেনে কাজ করতেই যে তাদের জন্ম। হামাগুড়ি দিয়ে যতবার তাদের ভাবনাচিন্তা কাঠের পা টেনে বা ভাঙা ডানা ঝাপটে কোথাও একটা যেতে চায়, ততবারই প্রকৃতি কী পদার্থ দিয়ে তাদের তৈরি করে কী ছাপ মেরে দিয়েছে তা আবারও স্পষ্ট হয়ে ওঠে। জনসাধারণের জন্য শিক্ষা আমাদের লক্ষ্য হতে পারে না। আমাদের লক্ষ্য হতে পারে সেই প্রকৃত যোগ্য ব্যক্তিদের প্রতিপালন যাদের মধ্যে মহান ও দীর্ঘস্থায়ী কীর্তি রচনা করার উপাদান আছে। আমরা কি বেশ ভালো ভাবেই জানি না যে যথার্থ কোনো উত্তরকাল অতীতযুগে নিঃসঙ্গ পদচারণা করা মহান নায়কদের উপর ভিত্তি করেই সে যুগের সার্বিক সাংস্কৃতিক পরিস্থিতিকে বিচার করবে; কীভাবে এই নায়কদের স্বীকৃত, উৎসাহিত ও সম্মানিত করা হয়েছে— বা প্রকারান্তরে ঠেলে সরিয়ে দিয়ে, দুর্ব্যবহার করে ধ্বংস করা হয়েছে— তা বিচার করেই সিদ্ধান্ত নেবে? বাধ্যতামূলক সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষার মতো উপায়ের মধ্য দিয়ে স্থিরীকৃত অভিপ্রায়ের অধীনে যখন জনগণকে ‘সংস্কৃতি’ দান করা হয়, তখন তা অত্যন্ত কাঁচা ও সম্পূর্ণ বাহ্য একটি পদ্ধতি হয়ে ওঠে। গভীরতর যে প্রদেশগুলোয় জনসাধারণ সংস্কৃতির সঙ্গে সংস্পর্শে আসে— যেখানে মানুষ তার ধর্মীয় প্রবৃত্তিকে ধারণ করে, তার অতিকথা-কল্পনার প্রতিমাগুলো নির্মাণ করতে থাকে, তার পরম্পরা-রীতি-রেওয়াজ ও মাতৃভূমির প্রতি বিশ্বস্ত থাকে— সেই গভীরতর প্রদেশগুলোয় কখনোই স্থিরীকৃত অভিপ্রায়ের পথে বলপূর্বক পৌঁছানো যায় না। এই আন্তরিক গহন প্রদেশগুলোয় জনশিক্ষার প্রাঙ্গনকে যদি সত্যিই বিস্তৃত করতে হয়, তাহলে বরং এই বলপূর্বক অভিপ্রায়পূরণের ধ্বংসাত্মক শক্তির বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলে জনসাধারণের সেই স্বাস্থ্যকর নিদ্রা স্বরূপ উপকারী অসচেতনতাকে সংরক্ষিত করতে হবে যা বিপরীত-ভার ও প্রতিষেধক হিসেবে যে কোনো সংস্কৃতির সর্বগ্রাসী টানাপোড়েন ও উত্তেজনাকে সহনীয় করে তোলে।

“কিন্তু জনসাধারণের এই উপকারী স্বাস্থ্যকর নিদ্রা যারা ভঙ্গ করতে চায়, তাদের আসল মতলবটাও আমি জানি। জনসাধারণের কানের কাছে তারা অনবরত চিৎকার করতে থাকে: ‘জাগো! সচেতন হও! চালাক-চতুর হও!’ স্কুলের সংখ্যার অস্বাভাবিক বৃদ্ধি এবং তার ফলস্বরূপ গর্বোদ্ধত এক শিক্ষককুলের সৃষ্টি শিক্ষার এক শক্তিশালী চাহিদাকে পূরণ করছে বলে তারা

ভনিতা করলেও তাদের আসল লক্ষ্য আমার অজানা নয়। তারা লড়াই করে মরছে আর এই হল তাদের লড়াইয়ের বহর: তারা লড়ছে বুদ্ধিবৃত্তির সাম্রাজ্যের স্বাভাবিক ধাপকাটা কাঠামোর বিরুদ্ধে, তারা ধ্বংস করতে চায় সর্বোচ্চ ও সর্বোত্তম সাংস্কৃতিক ক্ষমতার সেই শিকড়কে যা জনসাধারণের অসচেতনতার মৃত্তিকা ফুঁড়ে উঠে জিনিয়াসের জন্মদান ও লালনপালন করার মাতৃকর্তব্য পালন করে।

"কেবলমাত্র এই মায়ের রূপকের মধ্য দিয়েই আমরা প্রকৃত জনশিক্ষার গুরুত্ব এবং জিনিয়াসের প্রতি তার দায়িত্বকে অনুধাবন করতে পারি। সংস্কৃতি বা শিক্ষার থেকে জিনিয়াসের জন্ম হয় না: জিনিয়াসের উৎপত্তি অধিবিদ্যায়, তার স্বদেশও হল অধিবিদ্যা। কিন্তু একটি জনগোষ্ঠীর মধ্য থেকে উঠে এসে আবির্ভূত হতে হলে; সেই জনগোষ্ঠীর সার্বিক রূপ ও শক্তিকে তার বর্ণবহুত্বের পূর্ণ বৈচিত্র্যে যথাযথভাবে প্রতিফলিত করতে হলে, সেই জনগোষ্ঠীর সর্বোত্তম অভিপ্রায়কে এক ব্যক্তির প্রতীকী সারাৎসার ও কালজয়ী কাজের মধ্য দিয়ে উন্মোচিত করতে হলে এবং তার মধ্য দিয়ে শাশ্বতের সঙ্গে যোগসাধন ঘটিয়ে তাঁর জনগোষ্ঠীকে ক্ষণিকের সদাপরিবর্তমান গোলকের বন্দিত্ব থেকে মুক্তি দিতে হলে জিনিয়াসকে তাঁর নিজের জনগোষ্ঠীর সংস্কৃতির গর্ভে পরিপক্ক হয়ে উঠে সেই সংস্কৃতির কোলেই লালিত-পালিত হতে হয়। এই ভ্রূণবিকাশকারী আশ্রয়স্থলের লালন ছাড়া এমন আর দ্বিতীয় কোনও উপায় নেই যার মধ্য দিয়ে একজন জিনিয়াস তার ডানা মেলে শাশ্বত উড়ানে পাড়ি দিতে পারে। এই আশ্রয়স্থলের অবর্তমানে তাকে একজন অচেনা আগন্তুকের মতো বাস-অযোগ্য দেশ থেকে বিতাড়িত হয়ে শীতার্ত বিজনতায় মুখ লোকাতে হয়।"[২৯]

দার্শনিকের তরুণ সঙ্গী বলে উঠল, "গুরুদেব, আপনার এই জিনিয়াসের অধিবিদ্যা আমাকে বিস্মিত করছে। এই রূপকগুলোর অন্তর্নিহিত সত্য সম্পর্কে একটা ঝাপসা ধারণাই আমি করতে পারছি। কিন্তু তার আগে আপনি যে কথাগুলো বলেছেন, অর্থাৎ, জিমনাসিয়ামের অতিরিক্ত সংখ্যা ও তজ্জনিত কারণে শিক্ষকদের সংখ্যাধিক্যের কথা, তা আমি সম্পূর্ণরূপে বুঝতে পারি। আমার নিজের অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে আমি নিঃসন্দেহ হয়েছি যে বর্তমানে জিমনাসিয়ামের অভিমুখ নির্ধারিত হয়ে যাচ্ছে সেই ধরনের শিক্ষকদের বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা দিয়ে যাদের শিক্ষা বা সংস্কৃতি নিয়ে মূলত কিছু করার না থাকলেও শিক্ষা-সংস্কৃতি-বিশেষজ্ঞের ভান ধরে যারা শিক্ষাদাতার চাহিদার সুযোগ নিয়ে এই পথে এসে জুটেছে । হেলেনিয় পুরাকাল যে কত অনন্য এবং

ধরাছোঁয়ার নাগালের বাইরে কত দূরে, সেই দীপ্তিময় বোধের উন্মেষ যে একবার নিজ অভিজ্ঞতায় অনুভব করেছে এবং এই বোধকে রক্ষা করার জন্য কঠিন অভ্যন্তরীণ সংগ্রামের মধ্য দিয়ে গেছে, সে খুব ভালোই জানে যে এই বোধ বহুজনেরই নাগালের বাইরে থেকে যাবে। তেমন কোনো অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন মানুষের কাছে কেবলমাত্র পেশাগত কারণে অর্থাৎ ক্ষুন্নিবৃত্তির জন্য রোজগারের কারণে সেই পবিত্র কালখণ্ডের চারদিকে নির্লজ্জভাবে আনাড়ি হাতে মামুলি ছেনি-হাতুড়ি দিয়ে খোঁচাখুঁচি করে পুরাকালের গ্রিকদের ব্যবহার করা হল অতি অসংগত, এমনকি অতি ঘৃণ্য কাজ। অথচ ফিলোলজি[৩০] পাঠ করে আসা জিমনাসিয়াম শিক্ষকদের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশের মধ্যে ওই অমার্জিত অমর্যাদাকর মনোভাবই ছেয়ে আছে।

"ফিলোলজিস্টদের তরুণ প্রজন্মের দিকে একবার চেয়ে দেখুন। পুরাকালের গ্রিকদের জগতের মতো কোনো জগতের দীপ্তির পাশে নিষ্প্রভ আমাদের যে অস্তিত্বেরই অধিকার থাকে না সেই বোধটুকুও এদের মধ্যে বিরল। এই তরুণ তুর্কির দল বিনা দ্বিধায় বিনা সংশয়ে মহত্তম মন্দিরগুলোর ভিতরে নিজেদের ঘৃণ্য আস্তানাগুলো বেঁধেছে। সেই বিশ্ববিদ্যালয়-পড়ুয়া থাকার বছরগুলো থেকে পৃথিবীর অত্যাশ্চর্য ধ্বংসাবশেষগুলোর মধ্যে তারা আত্মতুষ্ট নির্লজ্জ ভঙ্গিতে ঘুরে বেড়াচ্ছে। তাদের বেশিরভাগের উদ্দেশ্যেই প্রতিটি কোণা থেকে সবল কন্ঠের এই নির্দেশ ধ্বনিত হয়ে ওঠা উচিত: 'এখান থেকে দূর হঠ অদীক্ষিতের দল! দীক্ষিত হওয়া তোমাদের পক্ষে অসম্ভব। কোনও কথা না বলে নীরবে মাথা নিচু করে এই পবিত্র স্থান ছেড়ে তোমরা বিদায় নাও।' হায়, সেই নির্দেশধ্বনিতেও হয়ত কোনো কাজ হবে না, কারণ এই ধরনের গ্রিক ঘরানার অভিসম্পাত বুঝতে হলেও নিজের মধ্যে কিঞ্চিত গ্রিকত্বের প্রয়োজন হয় যা এদের ছিটেফোঁটাও নেই। এরা এতই বর্বর যে ধ্বংসাবশেষের মধ্যে এরা যৎপরনাই আয়েস করে ছোট ছোট দোকান খুলে বসেছে, তাদের আধুনিক সব ধান্দা আর সুযোগসুবিধা লুকিয়ে নিয়ে এসে মহান স্তম্ভ ও শোকের সৌধগুলোর পিছনে গুঁজে রেখেছে আর তারপর নিজেদের গুঁজে রাখা জঞ্জালগুলো নিজেরাই এই অতি প্রাচীন পরিবেশে 'আবিষ্কার' করার ভান করে মহা হইহট্টগোল লাগিয়ে দিচ্ছে!...

" ... যদি আমার হাতে ছাড়া হতো, তাহলে পুরাকালের জগৎ নিয়ে কণামাত্র উৎসাহী মেধাবী বা মেধাহীন যে কোনো জনের হাত ধরে আমি খোলাখুলি বলতাম: 'ছটাক মাত্র পুঁথিগত বিদ্যাকে সম্বল করে এমন এক অভিযানে নামলে

পথে কী বিপদ তোমার জন্য অপেক্ষা করছে সে সম্বন্ধে কোনও ধারণা কি তোমার আছে, তরুণপ্রবর? তুমি কি জানো যে আরিস্ততল বলেছিলেন, উপড়ে পড়া মূর্তির নীচে চাপা পড়ে মরা কোনও ট্র্যাজিক মৃত্যু নয়?[৩১] সেই মৃত্যুর বিপদের মুখেই তুমি পড়তে যাচ্ছ! অবাক হলে নাকি? তোমার জানা থাকা উচিত যে বহু বহু দিন আগে উপড়ে পড়ে মাটিতে মিশে যাওয়া গ্রিক পুরাকালের মূর্তিকে আবার খাড়া করে দাঁড় করাতে ফিলোলজির পণ্ডিতরা শতকের পর শতক ব্যয় করেছে, আর সর্বদাই ব্যর্থ হয়েছে, কারণ তা হল এমন এক বিপুল বিরাট অতিকায় মূর্তি যা বেয়ে মানুষ কেবল অতিবামনের মতো ঘুরে ফিরতে পারে। বিপুল যৌথ প্রচেষ্টা, আধুনিক সংস্কৃতির সমস্ত জারিজুরি ও প্রকৌশলকে খাটানো হয়েছে, কিন্তু বারবার প্রতিবারই মাটি থেকে সেই মূর্তিকে একটুমাত্র তুলতে না তুলতেই আবার তা তার নীচে থাকা সমস্তজনকে পিষে দিয়ে হুড়মুড়িয়ে মাটিতে পড়েছে। তা হতে দেওয়াই হয়তো ভালো— প্রতিটি জীবকেই তো কোনও না কোনওভাবে মরতে হয়। কিন্তু এমন কি নিশ্চয়তা আছে যে এর মধ্য দিয়ে স্বয়ং মূর্তিটাই ভেঙেচুরে খানখান হয়ে যাবে না! গ্রিক পুরামূর্তির চাপে ফিলোলজির পণ্ডিতরা পিষে মরছে— সেই ক্ষতি আমরা সয়ে নিতে পারি। কিন্তু এই ফিলোলজির পণ্ডিতদের জন্য পুরাকালটাই যদি খানখান হয়ে বিনষ্ট হয়ে যায়— সে ক্ষতি অসহনীয়! একথা বিচার করে দেখ হে দুঃসাহসী তরুণপ্রবর, আর যদি মূর্তি ভাঙাই তোমার নেশা না হয়ে থাকে, তবে এই অভিযান থেকে বিরত হও।'”

দার্শনিক হেসে উঠে বললেন, “সত্যি বলতে গেলে বর্তমানে বহু ফিলোলজির পণ্ডিতই তোমার সাবধানবাণীকে মেনে পিছিয়ে এসেছে। আমার নিজের তরুণ বয়সের অভিজ্ঞতা থেকে এ অনেক আলাদা। সচেতনভাবেই হোক বা অসচেতনভাবে হোক, আজকে ফিলোলজির পণ্ডিতরা মোটের উপর এই সিদ্ধান্তে এসেছে যে তাদের পক্ষে ধ্রুপদী পুরাকালের সঙ্গে কোনো প্রত্যক্ষ সংস্পর্শ স্থাপন করা নিতান্তই অকারণ ও অসম্ভব। এমনকি তেমন কোনও অধ্যয়ন বা চর্চাকে তারা আজ নিষ্ফলা, গৌণ ও সেকেলে বলে মনে করে। তাই ততোধিক উৎসাহ নিয়ে এই পণ্ডিতদের দঙ্গল ভাষাতত্ত্বের উপর ঝাঁপিয়ে পড়েছে: সদ্য পরিষ্কার করা এই চাষের জমির সীমাহীন পরিধিতে এমনকি সবচেয়ে দুর্বল মস্তিষ্কেরও কিছু না কিছু কাজের কাজ মিলে যায়, যেখানে তাদের উচ্চাকাঙ্ক্ষার সীমাবদ্ধতাও একটি গুণ হিসেবে গণ্য হয় যেহেতু নতুন নতুন সব পদ্ধতির অনিশ্চয়তা এবং উদ্ভট ভ্রান্ত পদক্ষেপের নিত্য বিপদের মুখে সাদামাটা

ধরনের কাজই শ্রেয় বলে ধরা হয়। পুরাকালের ধ্বংসপ্রাপ্ত জগৎ থেকে কোনও মহিমময় স্বরের ধমকানি এখানে নবাগতের উদ্দেশ্যে ধ্বনিত হয় না। সমস্ত অভ্যাগতকেই সাদরে বরণ করে নেওয়া হয়। সোফোক্লিস[৩২] ও আরিস্তোফেনেস[৩৩] যাদের মনে কোনো দাগ কাটতে পারেনি, তাঁদের মতো লেখকরাও যাদের মধ্যে ক্ষণেকের জন্য কোনো সম্মানজনক চিন্তার জন্ম দিতে পারেনি, সেইসব অভাগাদেরও একটা ব্যুৎপত্তি-নির্ণায়ক তাঁতযন্ত্রের সামনে বসিয়ে দেওয়া যায় বা দূরে ছড়ানো ভাষারূপের ক্ষয়িত খণ্ডাবশেষ সংগ্রহের জন্য পাঠিয়ে দেওয়া যায়; আর সেভাবেই গিঁট বেঁধে বা ছিঁড়ে আলাদা করে, জড়ো করে বা ছড়িয়ে ছিটিয়ে দিয়ে, ক্ষেত্রসমীক্ষায় ছুটে বেড়িয়ে ও নির্দেশনা গ্রন্থ ঘাঁটাঘাঁটি করে তাদের দিন কেটে যায়।

"আর এখন এই কেজো গবেষকদেরই শিক্ষা দেওয়ার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে! ভাষাতত্ত্বের নামে তারা যে কাজ করেছে, কেবল তার জন্যই ধরে নেওয়া হয় যে যেসব প্রাচীন লেখকরা তাদের মনে অন্তর্দৃষ্টির উন্মেষ ঘটানো তো দূরের কথা, বিন্দুমাত্র রেখাপাতও করেনি, সেইসব লেখকদের বিষয়ে জিমনাসিয়াম ছাত্রদের কিছু না কিছু শিক্ষা দিতে তারাই সবচেয়ে যোগ্য! এ এক আচ্ছা ফাঁপর! পুরাকালের স্বর তাদের কানে পৌঁছয় না, তাই পুরাকাল নিয়ে তাদের কিছু বলারও নেই। তবু হঠাৎই তারা এই আলোকদর্শনে স্বাচ্ছন্দ্য খুঁজে পায়: তারা কি ভাষাসমূহের পণ্ডিত-গবেষক নয়? আর ওই প্রাচীন লেখকরা কি গ্রিক ও লাতিন ভাষায় লিখে যাননি? সুতরাং এখন তারা মনের সুখে ব্যুৎপত্তি-নির্ণায়ক তাঁতযন্ত্রটি চালাতে শুরু করে, হোমার দিয়ে শুরু করে, তারপর লিথুয়ানিয় বা চার্চ-স্লাভোনিককে সাহায্যের জন্য টেনে আনে, আর তুরুপের তাস হিসেবে টেনে বের করে পবিত্র সংস্কৃতকে— যেনবা জিমনাসিয়ামের গ্রিক ক্লাস আসলে ভাষাতত্ত্বপাঠের জন্য একটি সাধারণ প্রবেশিকাদানের অছিলা বৈ আর কিছুই নয়, যেনবা হোমারের সবচেয়ে বড় খুঁত ছিল যে তিনি প্রোটো-ইন্দো-ইউরোপিয় ভাষায় লেখেননি! অধুনা জিমনাসিয়ামের শিক্ষকরা যে ধ্রুপদী প্রবৃত্তি থেকে শতহস্ত দূরে বিরাজ করেন এবং নিজেদের এই দীনতা ঢাকার প্রয়োজনেই যে তুলনামূলক ভাষাতত্ত্বের পণ্ডিতি চর্চাকে এমনভাবে অগ্রাধিকারের আসনে বসান, সে কথা আজকালকার জিমনাসিয়ামগুলোর হালহকিকত সম্পর্কে ওয়াকিবহাল যে কোনওজনই মানবেন।"

তরুণ সঙ্গী বলল, "আমার মনে হয় যে আসল সমস্যা হল, ধ্রুপদী সংস্কৃতি যাঁরা পড়ান তাঁরা তাঁদের গ্রিক ও রোমানদের অন্য বর্বর জনগোষ্ঠীদের সঙ্গে

একসঙ্গে না দেখে আলাদা করে রাখেন, গ্রিক বা লাতিন যে অন্য আরো অনেক ভাষার পাশাপাশি অস্তিত্বমান ছিল তা তাঁরা কখনোই বিবেচনা করেন না। তাঁদের এই পৃথক করে ধ্রুপদী রূপ দেওয়ার প্রবণতার জন্য ভাষাগুলোর পারস্পরিক সম্পর্কের প্রশ্নটি সম্পূর্ণ অপ্রাসঙ্গিক হয়ে পড়ে থাকে, বিচারের মধ্যেই আসে না যে এই ভাষার কঙ্কালটির সঙ্গে ওই ভাষার কাঠামোর কোনও অনুরূপতা আছে কিনা। অনুরূপতা বিচারে আসে না। যতক্ষণ তাঁরা সংস্কৃতি শেখাতে গিয়ে অত্যুৎকৃষ্ট ধ্রুপদী আদিরূপের ছাঁচে নিজেকে ঢেলে গড়ে হাজির করতে চান, তাঁরা কেবল যা অসাধারণ তার দিকেই নজর দেন, যে অ-বর্বর গুণগুলো গ্রিক ও রোমানদের বাকিদের থেকে আলাদা ও উন্নত করেছিল সেগুলোকেই কেবল দেখেন।"

দার্শনিক বলল, "আমার ভুল হতে পারে, তবে আমার সন্দেহ হয় যে যেভাবে বর্তমানে জিমনাসিয়ামগুলোয় লাতিন ও গ্রিক পড়ানো হয় তার ফলে আমরা একটি মহার্ঘ বস্তুকে হারিয়ে ফেলছি। সেই মহার্ঘ বস্তু হল বচনে ও লিখনে স্বচ্ছন্দে নিজেকে প্রকাশ করতে পারার ক্ষমতা। আমার প্রজন্মের মানুষজন এ ব্যাপারে তুখোড় ছিল, এখন অবশ্য সবাই বৃদ্ধ এবং সংখ্যাও হ্রাস পেয়েছে। আজকের শিক্ষকরা এতটাই গ্রন্থনির্ভর ও ইতিহাসনির্ভর উপায়ে ছাত্রদের পাঠদান করেন যে এই ছাত্রদের মধ্য থেকে খুব বেশি হলে আরও কিছু খুদে সংস্কৃতজ্ঞ, কিছু ব্যুৎপত্তিশাস্ত্রী আতসবাজি বা উচ্ছৃঙ্খল অনুমাননির্ভর পাঠ-পুনর্নির্মাণের হাতুড়ে কারিগর পেতে পারি, কিন্তু এমন একজনকেও পাব না যে আমাদের বৃদ্ধদের মতো পাঠসুখে মজে প্লাটো বা টাসিটাস[৩৪] পড়তে পারবে। জিমনাসিয়ামগুলো এখনও বিদ্যাচর্চার চারা পালন করতে পারে, কিন্তু সে বিদ্যাচর্চা প্রকৃতই অত্যুৎকৃষ্ট অভিপ্রায় চালিত শিক্ষার স্বাভাবিক ও অহৈতুকী শাখাপ্রশাখা হিসেবে আর বিকশিত হবে না। জিমনাসিয়ামগুলো আজ এমন এক বিদ্যাচর্চা প্রসব করছে যা অত্যধিক পুষ্টিতে ফুলে ওঠা কোনও অসুস্থ দেহের সঙ্গে তুলনীয়। জিমনাসিয়াম রূপ ধাত্রীগৃহগুলো আজ বিদ্যাচর্চায় অসুস্থ মেদবহুলতা উৎপাদন করছে, যদি না তা ইতিমধ্যেই 'সমকালীন জার্মান সংস্কৃতি' উপাধিধারী সুবেশ বর্বরতার কুস্তির আখড়ায় অধঃপতিত হয়ে গিয়ে থাকে।"

প্রত্যুত্তরে তরুণ সঙ্গী বলল, "এই অগুন্তি অভাগা শিক্ষকদের পরিণতি কী হবে? প্রকৃত সংস্কৃতিকে ভেট দেওয়ার মতো কোনো সহজাত মেধা তাদের নেই, প্রাত্যহিক অন্নসংস্থানের প্রয়োজনীয়তাই তাদের শিক্ষক হিসেবে কাজ করতে

আসার দিকে ঠেলে দিয়েছে যেহেতু স্কুলের বাড়বাড়ন্ত সবসময়ই বাড়তি শিক্ষকের চাহিদা হাজির করছে। পুরাকালের মেঘমন্দ্র রাাজকীয় স্বর যখন তাদের খারিজ ঘোষণা করবে, তখন তারা কোথায় পালাবে? তারা কি বর্তমান যুগের সেই শক্তিরই শিকারে পরিণত হবে না যে শক্তিগুলো দিনের পর দিন সংবাদমাধ্যমের অবিশ্রান্ত হাঁকডাকের মধ্য দিয়ে তাদের উদ্দেশ্যে হেঁকে চলেছে: 'আমরাই হলাম সংস্কৃতি! আমরাই হলাম শিক্ষা! আমরা হলাম সর্বোচ্চ চূড়া! বিশ্ব ইতিহাসের সর্বোচ্চ শৃঙ্গ আমরাই!' এই লোভ-ধরানো আশ্বাসবাক্যগুলো তাদের কানে বর্ষিত হয়। কিন্তু সম্পূর্ণ অভিনব সর্বোন্নত সংস্কৃতি-রূপের ভিত্তিকাঠামো হিসেবে তাদের যা আঁকড়ে থাকতে বলা হয় তা প্রকৃতপক্ষে পত্রপত্রিকা ও সংবাদপত্রের গণভোজ্য 'সংস্কৃতি-বিষয়ক পাতা'-য় পরিবেশিত প্রতিসংস্কৃতির (অ্যান্টিকালচার-য়ের) অতি নিকৃষ্ট উপসর্গ ছাড়া আর কিছু নয়! এই আশ্বাসবাণীগুলোর সত্যতা সম্পর্কে কণামাত্র সংশয়ও যদি মনে টিকে থাকে, তাহলে তা নিয়ে এই অভাগারা যাবে কোথায়? তাদের যাওয়ার তো আর একটাই জায়গা পড়ে থাকে— তা হল সবচেয়ে নির্বোধ, সবচেয়ে পাণ্ডিত্যাভিমানী, বন্ধ্যা প্রাতিষ্ঠানিক জ্ঞানচর্চার মধ্যে আশ্রয় নেওয়া। সেখানে আশ্রয় নিলে অন্তত সংস্কৃতির জন্য এই অন্তহীন একঘেয়ে কর্কশ হল্লা আর শুনতে হবে না! এভাবে তাড়া খেয়ে উটপাখির মতো বালিতে মুখ গুঁজে পড়ে থাকাই কি তাদের পরিণতি নয়? উপভাষা, ব্যুৎপত্তিতত্ত্ব আর নানাপ্রকার আন্দাজের নিচে গর্ত খুঁড়ে প্রকৃত সংস্কৃতির থেকে শতমাইল দূরে পিঁপড়ের মতো এক ভূগর্ভস্থ জীবন যাপন করাই কি তাদের কাছে যথার্থ সুখ নয় যেহেতু সেমতাবস্থায় তাদের ঠেসে বন্ধ করা কর্ণকুহরে বর্তমানের সুবেশ 'সংস্কৃতি'-র মোহিনী সুর আর প্রবেশ করতে পারেনা?"

"ঠিকই বলেছ, বন্ধু," দার্শনিক বলল, "কিন্তু পাথরে খোদাই করে কোথায় এমন লেখা আছে যে কাঁড়ি কাঁড়ি এত স্কুল থাকতে হবে, আর সেজন্য আরও বেশি বেশি শিক্ষক থাকতে হবে? সবকিছুর পরে আমরা এটা ভালোই জানি যে আরো আরো বেশি স্কুলের চাহিদা এমন এক মহল থেকে ওঠে যা প্রকৃতপক্ষে প্রকৃত শিক্ষার বিরুদ্ধাচারী এবং তার পরিণাম শিক্ষার বিপরীত (অ্যান্টি-এডুকেশন) ছাড়া আর কিছুই হয় না। আমরা যে এহেন চাহিদাকে পাথরে খোদাই করা বিধান বলে ধরে নিই তার পিছনে একটাই মাত্র কারণ কাজ করে। সেই কারণ হল এই যে অধুনিক রাষ্ট্রের অভ্যাস দাঁড়িয়ে গেছে এ বিষয়ে নিজমত জানানো ও তার শিক্ষাগত দাবিগুলোকে তরবারি-ঝনঝনানি সহযোগে হাজির

করা। অধিকাংশ মানুষের উপর স্বভাবতই তা এত জোরালো প্রভাব বিস্তার করে যেনবা তা পাথরে খোদাই করা শাশ্বত সত্যবাণী, বস্তুপুঞ্জের আদি নিয়ম! প্রসঙ্গত, যে রাষ্ট্র এহেন দাবি করে— যাকে আজকাল 'সাংস্কৃতিক রাষ্ট্র'[৩৫] বলে অভিহিত করা হচ্ছে— তার জন্ম ও বিকাশ সাম্প্রতিককালে হয়েছে, গত পঞ্চাশ বছরের সময়পর্যায়েই কেবল তা 'স্বয়ংসিদ্ধ' হয়ে উঠেছে— গত পঞ্চাশ বছর তো এমন এক পর্ব যখন এমন কত না বস্তু ন্যূনতম সিদ্ধ না হয়েই 'স্বয়ংসিদ্ধ' হয়ে উঠেছে, 'স্বয়ংসিদ্ধ' শব্দটিই এই পর্বে অতি প্রিয় শব্দ হয়ে উঠেছে।

"এই আধুনিক রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে সবচেয়ে ক্ষমতাশালী হল প্রুশিয়া। প্রুশিয়া এতই উদ্ধত, আক্রমণাত্মক এবং একইসঙ্গে সংস্কৃতি ও শিক্ষানুশীলনের কেন্দ্রীভূত ব্যবস্থাপনায় এতই কঠোর-হস্ত যে তার আঁকড়ে ধরা সন্দেহজনক নীতি সাধারণভাবেই বিপজ্জনক হয়ে উঠেছে এবং বিশেষ করে প্রকৃত জার্মান চারিত্র্যের প্রতি বিপদের হয়ে উঠেছে। জিমনাসিয়ামগুলো যাতে, তাদের কথা মতো, 'সময়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলে', তার জন্য প্রণালীবদ্ধ ব্যবস্থাদি চূড়ান্ত করা হয়েছে। জিমনাসিয়ামে যত বেশি সংখ্যায় পারা যায় পড়ুয়া পাঠানোকে উৎসাহিত করা হচ্ছে, আর কার্যত এ জন্য রাষ্ট্র তার সবচেয়ে শক্তিশালী প্রলোভনকে ব্যবহার করছে— সেনায় চাকরিতে বিশেষ সুবিধা দেওয়ার টোপ ঝোলানো হয়েছে। এই টোপ এতই কাজে দিয়েছে যে সরকারি পরিসংখ্যায়কদের নিরপেক্ষ হিসাব অনুযায়ী দেখা যাচ্ছে, প্রুশিয়ার জিমনাসিয়ামগুলোয় উপছে-যাওয়া ভিড় এবং আরো আরো জিমনাসিয়াম খোলার অনবরত জরুরী চাহিদা শুরু হয়েছে এই নীতি লাগু হওয়ার সময় থেকেই। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের আধিক্য নিশ্চিত করার জন্য সিভিল সার্ভিসের সব উচ্চপদ থেকে শুরু করে অধিকাংশ তলার পদ অবধি নিয়োগে, বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশিকায় এবং সেনাবাহিনীর মধ্যে সবচেয়ে প্রভাবশালী ও উপরি-সুবিধা-যুক্ত পদগুলোয় নিয়োগের সঙ্গে জিমনাসিয়ামকে যুক্ত করে দেওয়ার থেকে ভালো আর কী হতে পারে? তার উপর, এমন একটা দেশে যেখানে আমলাতন্ত্রের সীমাহীন রাজনৈতিক উচ্চাশা এবং সর্বজনের জন্য বাধ্যতামূলক সামরিক কাজের প্রতি ব্যাপক জনসমর্থন যে কোনও প্রতিভাবানকে আপনা হতেই এই ক্ষেত্রগুলোর দিকে আকর্ষণ করে নেয়! জিমনাসিয়ামকে সর্বাগ্রে দেখা হয় সন্মান অর্জনের মইয়ে এমন এক ধাপ হিসেবে যা সরকারি ক্ষেত্রে অন্তর্ভুক্ত হতে চাওয়া যে কোনও উচ্চাকাঙ্খীকে অবশ্যই পার হতে হবে। স্বয়ং রাষ্ট্র এখানে সংস্কৃতির

গোঁসাই— এ এক নতুন প্রতীতি, অন্তত এক অদ্ভুত প্রতীতি তো বটেই। রাষ্ট্র তার প্রতিটি ভৃত্যকে কেবলমাত্র সাধারণ রাষ্ট্রীয় শিক্ষার মশাল হাতেই নিজেদের মুখ প্রদর্শন করতে বাধ্য করে তার নিজ স্বার্থ চরিতার্থ করে আর সেই মশালের কম্পমান আলোয় রাষ্ট্রকেই সমস্ত শিক্ষাগত প্রচেষ্টার সর্বোচ্চ লক্ষ্য বা পারিতোষিক হিসেবে হাজির করা হয়। এই ভৃত্যদের অন্তত এই শেষোক্ত বিষয়টি নিয়ে একটু থেমে ভাবনাচিন্তা করা উচিত। যেমন ধরা যাক, এমন এক প্রাসঙ্গিক প্রবণতার কথা তাদের মনে পড়া উচিত যে প্রবণতা সম্পর্কে বোঝাবুঝি খুব ধীরেই পূর্ণতা লাভ করেছিল, যে প্রবণতা হল একদা রাষ্ট্রের স্বার্থে রাষ্ট্রের লক্ষ্যপূরণের জন্য এগিয়ে দেওয়া একটি দর্শন: হেগেলের দর্শন।[৩৬] বোধহয় কোনো অত্যুক্তি হবে না যদি বলা হয় যে সমস্ত শিক্ষাগত উচ্চাকাঙ্ক্ষাকে রাষ্ট্রীয় অভিপ্রায়ের অধীন করার মধ্য দিয়ে প্রুশিয়া হেগেলের দর্শনের সেই একটি উত্তরাধিকারকেই আত্মসাৎ করতে সফল হয়েছে যা প্রকৃতই কার্যকরী করা সম্ভব: রাষ্ট্রের উপর দেবত্বারোপ হল সেই উত্তরাধিকার। আর রাষ্ট্রের উপর দেবত্বারোপের এই প্রক্রিয়া শিক্ষাকে অধীনস্থকরণের মধ্য দিয়েই তার শীর্ষবিন্দুতে পৌঁচেছে।”

দার্শনিকের সঙ্গী প্রশ্নাতুর ভাবে বলে উঠল, “কিন্তু এমন এক অদ্ভুত চর্চা থেকে রাষ্ট্র কী বা চাইতে পারে ? আমরা তো দেখছি কীভাবে অন্যান্য রাষ্ট্র প্রুশিয়ার স্কুলগুলোকে মুগ্ধ বিস্ময়ের চোখে দেখে, তাদের খুঁটিনাটি খতিয়ে দেখে আর কখনও কখনও তাদের অনুকরণ গড়ে তুলতে চেষ্টা করে— কেবল এর থেকেই বোঝা যায় যে এগুলো নিশ্চয়ই কোনো উদ্দেশ্যসাধন করছে। স্পষ্টতই অন্যান্য রাষ্ট্র এই স্কুলগুলোকে রাষ্ট্রের দীর্ঘজীবীতা ও ক্ষমতার জন্য কার্যকরী হিসেবে দেখছে, ঠিক যেমন সেনায় অংশগ্রহণ বাধ্যতামূলক করার বিখ্যাত রীতিকে দেখা হয়েছিল এবং এখনাবধি তা ব্যাপকভাবে অনুসৃত হয়েছে। প্রুশিয়ায় এখন প্রত্যেকেই কোনো না কোনো সময় গর্বের সঙ্গে সেনার উর্দি গায়ে চাপিয়েছে এবং কার্যত জিমনাসিয়ামের মাধ্যমে রাষ্ট্রের সাংস্কৃতিক উর্দিও গায়ে চড়িয়ে নিয়েছে, ফলে কোনও অত্যুৎসাহী এমন বলে ফেলতেই পারে যে রাষ্ট্রের সর্বশক্তিমত্তার ধ্রুপদী দশা, যা এতাবধি কেবল প্রাচীন প্রাগৈতিহাসিক কালেই অর্জিত হয়েছিল, তা আবার আয়ত্তের মধ্যে এসেছে এবং প্রায় প্রতিটি তরুণই প্রবৃত্তি ও প্রশিক্ষণের তাড়সে তাকেই মানব অস্তিত্বের সর্বোচ্চ রূপ ও অভিপ্রায় হিসেবে গণ্য করছে।”

দার্শনিক বলে উঠলেন, "তেমন কোনো প্রতিতুলনা এক অত্যুৎসাহীর অতিকথন বৈ আর কিছু নয়, তা কেবল একাধিক খোঁড়া পায়ে খুঁড়িয়ে চলার সামিল। মূর্তভাবে রাষ্ট্রকে সেবা করলে তবেই সংস্কৃতি সম্মানীয় এবং যেসব আবেগকে তৎক্ষণাৎ রাষ্ট্রের প্রয়োজনে খাপ খাওয়ানো যাবে না সেসব পদদলিত করে নিশ্চিহ্ন করতে হবে— এই উপযোগিতাবাদী দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে প্রাচীন রাষ্ট্রের কোনো মিল নেই, বরং অমিল ভয়ানক। ঠিক এই কারণেই সুগভীর গ্রিকরা যে জন্য রাষ্ট্রের প্রতি শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা বোধ করত তা আধুনিক মানুষের কাছে বেয়াড়ারকমের অদ্ভুত বলে মনে হবে: সেই গ্রিকরা বুঝত যে সংস্কৃতির কোনও একটি বীজও রাষ্ট্রের প্রয়োজনীয় রক্ষণাবেক্ষণ ছাড়া বেড়ে উঠতে ও বিকশিত হতে পারে না; বুঝত যে সেইসব রক্ষণাবেক্ষণকারী প্রতিষ্ঠানগুলোর প্রজ্ঞাবান ও যত্নশীল আশ্রয়ের জন্যই ইতিহাসে অনন্য তাদের সমগ্র অননুকরণীয় সংস্কৃতি অত সুপ্রচুর সমৃদ্ধিলাভ করতে পেরেছিল। রাষ্ট্র তখন সংস্কৃতির সীমান্তরক্ষী বা নিয়ামককর্তা ছিল না, সংস্কৃতির পাহারাদার বা জেলরক্ষীও ছিল না; রাষ্ট্র ছিল সংস্কৃতির এমন এক দৃঢ় সবল লড়াকু কমরেড ও সঙ্গী যে তার শ্রদ্ধেয় সম্ভ্রান্ত এবং, বলা যায়, অত্যুৎকৃষ্ট বন্ধুকে কর্কশ বাস্তবের পথে পাহারা দিয়ে নিয়ে যায় এবং সেইজন্য তার বন্ধুর কৃতজ্ঞতাভাজন হয়। বিপরীতদিকে, আজ যখন রাষ্ট্র আমাদের কাছ থেকে অত্যুৎসাহী কৃতজ্ঞতা দাবি করে, তা কখনই জার্মান উচ্চতর সংস্কৃতি বা চারুকলার বীরত্বপূর্ণ রক্ষণাবেক্ষণের জন্য নয়। আমাদের মহান কবি ও শিল্পীরা জার্মান শহরগুলোয় কীভাবে উদযাপিত হন এবং এই প্রতিভাবানদের চারুকলা-প্রকল্পগুলি রাষ্ট্রের সহায়-সমর্থন কতটা পায় সে দিকে ক্ষণিকের জন্য চোখ ফেরালেই দেখা যাবে যে এইক্ষেত্রে জার্মানির বর্তমান, তার অতীতের থেকে কোনো অংশেই কম লজ্জাকর নয়।

"এখানে 'সংস্কৃতি' নামে পরিচিত সব বস্তুর পৃষ্ঠপোষকতা করাই হল রাষ্ট্রের প্রবণতা, আর তার মধ্য দিয়ে রাষ্ট্রের প্রাধিকারী ক্ষমতার কাছে মাথা নত করে থাকা ছদ্ম-সংস্কৃতিকেই রাষ্ট্র আসলে তুলে ধরে— এই উভয়েরই নিশ্চয় কিছু কারণ আছে। খাঁটি জার্মান চারিত্র্য বা তার থেকে উদ্ভূত কোনও সংস্কৃতি বা শিক্ষার বিরুদ্ধে রাষ্ট্রের এই প্রবণতা খোলাখুলি বা আড়ালে থেকে যুদ্ধ করে চলেছে— যা আমি দ্বিধান্বিত রেখায় হলেও তোমার সামনে এখানে আঁকতে চেয়েছি, বন্ধু। তাই, এত তীব্র উৎসাহে শিক্ষা সম্পর্কে যে ধারণাকে রাষ্ট্র উৎসাহিত ও বর্ধিত করতে চাইছে, এবং যার জন্য তার স্কুলগুলো বিদেশে এত প্রশংসা কুড়োচ্ছে, সেসবের শিকড় এমন এক বলয় থেকে পুষ্টি সংগ্রহ করছে

যার সঙ্গে খাঁটি জার্মান চারিত্র্যের কোনও যোগাযোগ নেই। খাঁটি জার্মান চারিত্র্য কত না বিস্ময়কর স্বরে কথা বলে জার্মান পুনর্গঠন, জার্মান সংগীত ও জার্মান দর্শনের অন্তস্থল থেকে। আর রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষণায় হাবুডুবু খেতে থাকা শিক্ষাব্যবস্থা এমন উপেক্ষা-অবজ্ঞার চোখে এই খাঁটি জার্মান চারিত্র্যকে দেখে থাকে যেনবা তা কোনও নির্বাসিত রাজপুত্র। এই খাঁটি জার্মান চারিত্র্য তাই আজ বিজন শোকে ভবঘুরের মতো ঘুরে বেড়ায়, আর তার নাম ও মাহাত্ম্য ভাঁড়িয়ে 'সংস্কৃতিবান' স্কুলশিক্ষক ও সংবাদলেখকদের তুমুল হর্ষধ্বনির মাঝে ছদ্ম-সংস্কৃতি 'জার্মান' শব্দটি নিয়ে তামাশা করে ধুনুচি নাচিয়ে বেড়ায় ।

"রাষ্ট্রের কী প্রয়োজন এত অতিরিক্ত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও শিক্ষক নিয়ে? এত ব্যাপক মাত্রায় জাতীয় শিক্ষা ও জনপ্রিয় জ্ঞানছত্র পৃষ্ঠপোষণা করারই বা কী প্রয়োজন? প্রয়োজন, কারণ, খাঁটি জার্মান চারিত্র্যকে তারা ঘৃণা করে, প্রকৃত শিক্ষা ও সংস্কৃতির অভিজাত চরিত্রকে তারা ভয় পায়, মুষ্টিমেয় মহৎজনেদের স্বেচ্ছারোপিত নির্বাসনে পাঠাতে তারা বদ্ধপরিকর যাতে সংস্কৃতির ভড়ং-য়ের বীজ বহুজনের মধ্যে রোপণ করে চাষ করা যায়, কারণ তারা মহৎ নেতা হওয়ার জন্য দরকারী দৃঢ়-কঠিন নিয়মানুবর্তিতা এড়িয়ে যাওয়ার অভিপ্রায়ে জনতাকে বিশ্বাস করাতে চায় যে রাষ্ট্রকে ধ্রুবতারা করে জনতা নিজেরাই পথ খুঁজে নিতে পারে! রাষ্ট্র কি না সংস্কৃতির ধ্রুবতারা— এ বেশ অভিনব বটে!

"এমতাবস্থায় একটা জিনিষই আমাকে সান্ত্বনা দেয়। এভাবে আক্রান্ত হয়েও, তাকে হঠিয়ে তার জায়গায় এমন এক ভুয়ো প্রতারককে এনে বসালেও, খাঁটি জার্মান চারিত্র্য তার সাহস হারায়নি। সে লড়াই জারি রেখে বিশুদ্ধতর এক যুগে প্রবেশের পথ করে নিয়ে নিজেকে ঠিক রক্ষা করবে। সে যখন জয়ী হবে, অবরুদ্ধ ও নাজেহাল রাষ্ট্র ছদ্ম-সংস্কৃতির সঙ্গেই গলাগলি করে থাকলেও, সে তার চরিত্রগত আভিজাত্যের জন্যই সেই রাষ্ট্রের প্রতি এক প্রকার সহানুভূতিশীল মনোভাব বজায় রাখবে। যতই হোক না কেন, মানুষদের উপর শাসন চালানো যে কত কঠিন তার কতটাই বা আমরা জানি! যে লাখো লাখো মানুষদের অধিকাংশই সীমাহীনভাবে স্বার্থপর, অন্যায়াচারী, যুক্তিবোধহীন, অসৎ, ঈর্ষাকাতর, বিদ্বেষপরায়ণ, নীচমনা এবং একই সঙ্গে সংকীর্ণচেতা ও বিপথগামী, তাদের মধ্যে আইন, শৃঙ্খলা, শান্তি ও সমৃদ্ধি বজায় রাখা; আবার একই সাথে লোলুপ পড়শি ও বিশ্বাসঘাতক চোরদের গ্রাস থেকে রাষ্ট্র-আহৃত যৎকিঞ্চিত সম্পদকে রক্ষা করার জন্য প্রতিনিয়ত লড়ে যাওয়া— এই চাপের মুখে পড়ে রাষ্ট্র যাকে পায় তার উপরই মিত্র রূপে ভরসা করতে যায়। আর যখন তেমন

কোনো মিত্র আত্মম্ভরি কথার ফুলঝুরি সাজিয়ে নিজেকে সেবক হিসেবে হাজির করে, যখন সে হেগেলের মতো 'সম্পূর্ণভাবে নিখুঁত করে তোলা নৈতিক গঠন' হিসেবে রাষ্ট্রকে বর্ণনা করে এবং কীভাবে একটি ব্যক্তি সবচেয়ে ভালোভাবে রাষ্ট্রের স্বার্থ চরিতার্থ করতে পারে সেই উপায় ও পদ্ধতি আবিষ্কারকেই শিক্ষার কর্তব্য বলে তুলে ধরে, তখন আর অবাক হওয়ার কী আছে যে রাষ্ট্র সেরূপ মিত্রকে সাষ্টাঙ্গে জড়িয়ে ধরে নিজ গাঢ় বর্বর স্বরে পূর্ণ বিশ্বাসে আপ্লুত হয়ে বলে ওঠে: 'আপনি, হ্যাঁ, আপনিই হলেন শিক্ষা! আপনিই হলেন সংস্কৃতি!' "

...যখন রাষ্ট্র বিশ্বাস করতে শুরু করে যে সংস্কৃতি তার নিয়ন্ত্রণাধীন এবং সংস্কৃতির মাধ্যমে সে রাষ্ট্রীয় অভিপ্রায় পূর্ণ করতে পারে; যখন বিদেশী শত্রুর বিরুদ্ধে ও একইসঙ্গে দার্শনিক যাকে 'প্রকৃত জার্মান চারিত্র্য' বলছিলেন তার বিরুদ্ধে সংগ্রামে রাষ্ট্র সংস্কৃতিকে তার ভাড়াটে সৈন্য করে তোলে, তখনই সংস্কৃতির কেন্দ্রস্থলে অবধারিতভাবে যে অদ্ভুত অধোগতি কাজ করতে শুরু করে, তার দিকে দার্শনিক তাঁর সঙ্গীর মনোযোগ বিশেষভাবে আকর্ষণ করতে চাইছিলেন। দার্শনিক বারবার বলছিলেন যে প্রকৃত জার্মান চারিত্র্য তার সর্বোৎকৃষ্ট প্রয়োজনগুলোর সূত্রে সেই গ্রিক চারিত্র্যের সঙ্গে যুক্ত যা তার উচ্চ নিখাদ অভিপ্রায় নিয়ে অটল থেকে সেই কঠিন পুরাকালে তার স্থিরসংকল্প দৃঢ়তা ও সাহস প্রমাণ করেছে আর যা তার চারুকলার মধ্য দিয়ে এই বর্তমান সময়েও আধুনিকতার অভিশাপ থেকে আধুনিক মানুষকে মুক্ত করার অতি গুরুত্বপূর্ণ কাজটি করতে পারে। অথচ এই প্রকৃত জার্মান চারিত্র্যের উপরই তার উত্তরাধিকার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে বিজনবাসের অভিশাপ নেমে এসেছে। তবু এই বর্তমানের পতিতভূমির মধ্য দিয়ে প্রতিধ্বনিত হয়ে চলা তার মন্দগতি বিলাপরোল আমাদের সময়কার রুচিহীন জাঁকজমকে ঠাসা সাংস্কৃতিক ক্যারাভানগুলোর মনে ভয় জাগায়। দার্শনিক জোর দিয়ে বলছিলেন যে আমাদের এই ভয় জাগাতে হবে, কেবল ভেবে আকুল হলে হবে না; আক্রমণ শানাতে হবে, গোবেচারার মতো পালালে হবে না; যে ব্যক্তির উচ্চতর প্রবৃত্তি তাকে বর্তমানের বর্বরতার বিরুদ্ধে ঘৃণায় পূর্ণ করে তুলেছে, তাকে নিয়ে দুশ্চিন্তার কিছু নেই। "তেমন কেউ যদি ধ্বংসও হয়ে যায়, যতক্ষণ গহন থেকে উপছানো মরমী বাষ্প নির্গত হচ্ছে পিথিয় দেবতা দ্বিতীয় কোনো পিথিয়ায় নতুন বেদি তৈরি করে নিতে নারাজ হবে না।"[৩৭]

দার্শনিক আবার তাঁর জলদগম্ভীর স্বরে বললেন, "ভালো করে খেয়াল করে নাও যে দুটো জিনিষকে কখনই একে অপরের সঙ্গে গুলিয়ে ফেলা উচিত নয়।

যে কোনো ব্যক্তিকে বেঁচে থাকতে হলে, বেঁচে থাকার সংগ্রামে যুঝতে হলে অনেক কিছু শিখতে হয়— কিন্তু সেই লক্ষ্যে ব্যক্তিবিশেষ যা শেখে বা যা করে, তার সঙ্গে শিক্ষা ও সংস্কৃতির কোনো সম্পর্ক নেই। বরং তার বিপরীতে, প্রয়োজন, অভাব ও সংগ্রামের জগতের অনেক উপরের এক বায়ুস্তরে সংস্কৃতির সূচনা হয়। কোনো ব্যক্তিবিশেষ অপর ব্যক্তিদের সাপেক্ষে নিজেকে কতটা মূল্য দেয়, টিকে থাকার ব্যক্তিগত সংগ্রামে নিজের কতটা শক্তি ব্যয় করার সিদ্ধান্ত সে নিয়েছে, এগুলোই প্রশ্ন। কেউ কেউ সুখভোগের প্রতি চরম উদাসীনতা নিয়ে নিজ প্রয়োজন সীমাবদ্ধ রেখে খুব সহজে দ্রুত সেই বলয়ে উঠে যেতে পারে যেখানে আত্মভাব ভুলে বা ঝেড়ে ফেলে সময়চিহ্নহীন নৈর্ব্যক্তিক ভাবনার সৌরমণ্ডলে চিরযৌবন উপভোগ করতে পারে। আবার অন্যরা নিজেদের বিষয়ী চাহিদা ও প্রভাববলয়ের বৃদ্ধি ঘটিয়ে নিজেদের জন্য এমন এক অতিবৃহৎ জমকালো সমাধিস্তম্ভ নির্মাণ করতে থাকে যেনবা সেভাবেই সে সময়ের মতো দানবীয় শত্রুকে হার মানাতে পারবে। এই তাড়নার মধ্যে আমরা অমরত্বের জন্য আকাঙ্ক্ষাকেও সেঁধিয়ে থাকতে দেখি: ধনসম্পদ, ক্ষমতা, চৌখস বুদ্ধি, চটপটে চতুরতা, বাগ্মীতা, স্বাস্থ্যবান চেহারা, বিখ্যাত বংশপরিচয়— এসব আর কিছু নয় কেবল সেই বিভিন্ন উপায়াদি যার মধ্য দিয়ে অতোষণীয় ব্যক্তিগত জীবনবল নতুন জীবন কামনা করে, মোহজনক অমরত্বের তৃষ্ণায় ভ্রমে মজে।

"কিন্তু বিষয়ীভাবের এই সর্বোচ্চ দালানে বিস্তৃত ও তথৈব সমষ্টিগত ব্যক্তিত্বের সর্বোচ্চসম্ভব চাহিদা নিয়ে চাহিদাতাড়িত সেই সত্তার সঙ্গে প্রকৃত সংস্কৃতি ও শিক্ষার কোনো সংস্পর্শ নেই। আর যখন তেমন কোনো ব্যক্তি চারুকলা সম্পর্কেও আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করে, তা কেবল চারুকলার উজ্জীবক বা চিত্তবিক্ষেপকারী ক্ষমতার জন্য, তার সঙ্গে চারুকলার খাঁটি মহান দিকগুলোর চেয়ে দূষিত অধঃপতিত দিকগুলোরই সম্পর্ক বেশি। এহেন ব্যক্তি তার সকল কাজকর্মেই অপরের চোখ ধাঁধিয়ে দিলেও নিজে অস্থির বাসনাকুল আত্মভাব থেকে মুক্ত হতে পারে না। আত্মহীন চিন্তানুশীলনের আলোকিত ইথারিয় পরিসর তার ধরাছোঁয়ার বাইরে থেকে যায়। সুতরাং যতই সে চর্চা করুক, ভ্রমণ করুক ও সংগ্রহ করুক না কেন, তার গোটা জীবন প্রকৃত সংস্কৃতির থেকে অপার দূরে নির্বাসিত হিসেবেই কেটে যায়। কারণ, অভাবী বাসনাকুল ব্যক্তিসত্তার দূষণকে প্রকৃত সংস্কৃতি ঘৃণা করে; নিজেদের আত্মম্ভরিতা পোষণে যারা সংস্কৃতিকে ব্যবহার করতে চায়, প্রকৃত সংস্কৃতি তাদের অত্যন্ত বুদ্ধি করে এড়িয়ে চলে; যখন কেউ ভেবে বসে যে সে সংস্কৃতির মালিক, সংস্কৃতিকে ব্যবহার করে সে তার

প্রয়োজন মেটাবে ও রোজগার করবে, তখনই প্রকৃত সংস্কৃতি তার দিকে উপহাসের দৃষ্টি হেনে নিশঃব্দ চরণে দ্রুত সেখান থেকে অন্তর্হিত হয়।

"বন্ধু, তাই অতি আদরের সেই ললিতকায়া ইথারিয় দেবী সংস্কৃতিকে আজকাল একই নামে পরিচিত হয়ে ওঠা নেহাতই বুদ্ধিবৃত্তীয় ভৃত্য এবং জীবনের প্রয়োজনাদি, দারিদ্র্য ও জীবিকার্জনে ক্ষণমন্ত্রণাদাতা কেজো দাসীর সঙ্গে কখনই গুলিয়ে ফেলো না। আমরা যে অর্থে সংস্কৃতি বুঝি, কেরিয়ার বা জীবিকার্জনের নিমিত্তে উদ্দিষ্ট কোনও শিক্ষাক্রম সেখানে পৌঁছে দিতে পারে না। সেরূপ শিক্ষাক্রম কেবলমাত্র টিকে থাকার সংগ্রামে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখা বা নিরাপদে রাখার পথই শেখায়। অবশ্য এটাই বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ মানুষের কাছে সবচেয়ে বেশি মাথাব্যথার কারণ, আর, টিকে থাকার সংগ্রাম যত বেশি কঠিন হয়ে ওঠে, তরুণাবস্থায় ততই বেশি এহেন শিক্ষাক্রমের মধ্যে যুঝে যাওয়ার চাপ বাড়ে। কিন্তু এই যোঝাযুঝিকে উৎসাহিত ও পরিচালিত করে যেসব প্রতিষ্ঠান, সেগুলোকে যেন কেউ প্রকৃত অর্থে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বলে ভুল না করে। ওইসব প্রতিষ্ঠান সরকারি আমলা, দোকানদার, সেনা, ব্যবসায়ী, কৃষক, চিকিৎসক বা প্রযুক্তিবিদ যাই-ই তৈরি করছে বলে দাবি করুক না কেন, তারা আসলে ওই টিকে থাকার সংগ্রামে জেতার উপায় ছাড়া আর কিছুই শেখাচ্ছে না। তাই প্রকৃত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের থেকে তাদের মান বিধিনিয়ম একেবারেই আলাদা হতে বাধ্য— এক জায়গায় যা চলে বা যা আকাঙ্ক্ষিত, অপর জায়গায় তা ভয়ংকর অধর্ম বলে মনে করা হতে পারে।

"তোমায় একটা উদাহরণ দেওয়া যাক। একজন তরুণ ব্যক্তিকে যদি শিক্ষার সঠিক পথে নিয়ে যেতে চাও, তোমাকে খেয়াল রাখতে হবে যাতে প্রকৃতির সঙ্গে তার সরল বিশ্বাসের প্রত্যক্ষ ও ব্যক্তিগত সম্পর্কটি না ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তার সঙ্গে যেন অরণ্য ও পাথর, ঝড়, শকুন, একক একটি ফুল, প্রজাপতি ও ঘাসজমি ও পাহাড়ঢাল নিজেদের ভাষায় কথা বলতে পারে— তাদের মধ্যে যেন সে নিজেকে দেখতে পারে এমনভাবে যেনবা নিত্যপরিবর্তনশীল প্রকাশের বর্ণময় ঘূর্ণাবর্ত্যে অগুনতি আয়নায় তার প্রতিফলন ভেসে উঠছে, আর তার মধ্য দিয়ে সে প্রকৃতির মহান প্রতীকের মধ্যে সমস্ত বস্তুর আধিবিদ্যক একত্বকে অসচেতনভাবে অনুভব করবে, আর একইসঙ্গে প্রকৃতির চিরায়ত সহিষ্ণুতা ও আবশ্যকীয়তা থেকে শান্তি আহরণ করবে। কিন্তু প্রকৃতির এই ঘন সান্নিধ্যে, প্রকৃতির সঙ্গে প্রায় এক ব্যক্তিগত সম্পর্কবন্ধনের মধ্যে কতজনা তরুণকেই বা বেড়ে উঠতে দেওয়া হয়? বেশিরভাগকেই এক আলাদা সত্য শিখতে বাধ্য করা হয়, এবং তাও অতি অল্প

বয়সেই, তা হল: কীভাবে প্রকৃতিকে জোয়ালে বেঁধে তাদের আধিপত্যাধীন করা যায়! সরল অধিবিদ্যার সেখানেই ইতি; তরুণ ব্যক্তিদের উপরে উদ্ভিদবিদ্যা, প্রাণীবিদ্যা, ভূবিদ্যা ও অজৈব রসায়ন প্রকৃতি সম্পর্কে একটি সম্পূর্ণ আলাদা দৃষ্টিভঙ্গি জোর করে চাপিয়ে দেয়। এই বাধ্যতামূলক নতুন দৃষ্টিভঙ্গির প্রকোপে যা হারিয়ে যায় তা কোনো কাব্যিক দৃষ্টিবিভ্রম নয়, বরং তা হলো প্রকৃতি সম্পর্কে একমাত্র সত্য সতঃপ্রবৃত্ত উপলব্ধি। সেই সত্য সতঃপ্রবৃত্ত উপলব্ধির জায়গা জুড়ে বসে ধূর্ত হিসাবনিকাশ ও প্রকৃতিকে ঠকিয়ে পরাজিত করার নানা ছলবলকৌশল। কেবলমাত্র প্রকৃত শিক্ষিত কোনো ব্যক্তিই তাঁর শৈশবের চিন্তাশীল প্রবৃত্তির প্রতি একনিষ্ঠ থাকার অমূল্য সম্পদটি রক্ষা করতে পারেন এবং তার মধ্য দিয়ে তিনি এমন এক শান্তি, একতা, সাহচর্য ও সুস্বনতা অর্জন করতে পারেন যা টিকে থাকার সংগ্রামে যোঝার জন্য প্রশিক্ষিত কোনো জনের কল্পনারও অতীত।

"তাই, বন্ধু, ভেব না যে আমাদের রিয়ালস্কুলে ও উচ্চতর বার্গারস্কুলেগুলোর যে প্রশংসা প্রাপ্য তা দিতে আমি কার্পণ্য করছি।[৩৮] যেখানে শিশুদের অঙ্ক শেখানো হয়, বাণিজ্যের ভাষা রপ্ত করানো হয়, গুরুত্ব সহকারে ভূগোল পড়ানো হয় এবং প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের বিস্ময়কর আবিষ্কারগুলোকে আয়ত্ত করানো হয়, সেইসব জায়গাকে আমি সম্মান করি। স্বীকার করতে আমার কোনোই দ্বিধা নেই যে তুলনায় ভালো রিয়ালস্কুলেতে প্রস্তুত হওয়া শিক্ষার্থীরা আমাদের জিমনাসিয়ামের স্নাতকদের সঙ্গে একই সুবিধা ভোগ করার অধিকারী। বিশ্ববিদ্যালয় ও রাষ্ট্রীয় দপ্তর এখনও অবধি কেবল জিমনসিয়াম-স্নাতকদের জন্যই খোলা, অচিরেই যে সেসব রিয়ালস্কুলের ছাত্রদের জন্যও খুলে যাবে তা নিয়েও আমার কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু খেয়াল করো, আমি বলছি যে জিমনাসিয়ামের স্নাতকদের মতো একই সুবিধার অধিকারী হওয়ার কথা! এই যন্ত্রণাকর পশ্চাৎচিন্তাটি এখানে জুড়ে না দিয়ে পারছি না: রিয়ালস্কুল ও জিমনাসিয়ামগুলোর লক্ষ্য যদি আজ একই দাঁড়িয়ে থাকে, তাদের মধ্যে পার্থক্য যদি নগণ্য হয়, রাষ্ট্রের কাছ থেকে সমান স্বীকৃতি পাওয়ার হকদার হয়, তাহলে তার মানে হল এই যে অন্য এক ধরনের প্রতিষ্ঠানের অভাব অত্যন্ত প্রকট— তা হল প্রকৃত শিক্ষার প্রতিষ্ঠান! এটা বলার মধ্য দিয়ে আমি বিন্দুমাত্রও রিয়ালস্কুলের সমালোচনা করতে চাইছি না। রিয়ালস্কুলেগুলো তাদের অনেক নিম্নস্তরের হলেও অত্যন্ত দরকারী উদ্দেশ্যগুলো প্রশংসনীয় সততা ও সাফল্যের সঙ্গে পালন করেছে, কিন্তু জিমনাসিয়ামগুলোর ক্ষেত্রে সততা এবং সাফল্য দুটোই অনেক

কম। সেখানে আমরা এক ধরনের স্বভাবজাত লজ্জাবোধকে ফুটে উঠতে দেখি, যা হয়ত এই ঘটনারই অসচেতন স্বীকৃতি যে গোটা প্রতিষ্ঠানটাই ভয়ঙ্করভাবে অধঃপতিত, সেখানকার বর্বরোচিত উচ্ছিন্নতা ও বন্ধ্যা বাস্তবতায় সেখানে শিক্ষকতারত ধূর্ত যুক্তিবিস্তারকারীদের উচ্চনিনাদী বিদ্যাধরী শব্দগুলো তলিয়ে যায়। কোনো প্রকৃত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নেই! তথাকথিত 'বাস্তবতা'-র আঁচ পোয়নো হুঁকোমুখোদের চেয়ে ওইসব সংস্কৃতি ও শিক্ষা নকলনবিসির চেষ্টারত ভুয়ো প্রতিষ্ঠানগুলোয় মানুষজন আরো বেশি আশাহত, মৃতকল্প ও অসন্তুষ্ট হয়ে আছে। প্রসঙ্গতঃ, এই শিক্ষকদের দল যে কতটাই অপরিপক্ক ও জ্ঞানহীন, তা বুঝতে আর বাকি থাকে না যখন তারা 'বাস্তব' ও 'বাস্তববাদ'-র মতো সুনির্দিষ্ট দার্শনিক অভিধাগুলোকেও এমনভাবে সম্পূর্ণ ভুল বুঝতে সক্ষম হয় যে তাদের পিছনে বস্তু ও আত্মার বিপক্ষতা খুঁজে বেড়ায় ও 'প্রকৃত বাস্তবতাকে চেনা, নির্মাণ করা ও দখলে আনার প্রবৃত্তি'-কে 'বাস্তববাদ' বলে ব্যাখ্যা করে।

"আমার অন্তত মনে হয় যে সত্যিকারের বিপক্ষতা কেবল একটিই, তা হল শিক্ষার প্রতিষ্ঠান ও টিকে থাকার সংগ্রামের প্রতিষ্ঠানের মধ্যে বিপক্ষতা। আজ যা প্রতিষ্ঠান আছে সবই ওই দ্বিতীয় শ্রেণির, কিন্তু আমি প্রথম শ্রেণির প্রতিষ্ঠান বর্ণনা করতে চাইছি।"

দুই দার্শনিক সহচরের এহেন অদ্ভুত ও অস্বস্তিকর প্রসঙ্গ আলোচনা করতে করতে প্রায় দুই ঘন্টা কেটে গেছে। রাত্রি নেমে এসেছে। গোধূলির উপান্তে দার্শনিকের কন্ঠ যদি এক রকম প্রাকৃতিক সঙ্গীতের মতো ধ্বনিত হয়ে থাকে, এখন ঘনায়মান রাত্রির এই নিখাদ অন্ধকারে যখনই তা উত্তেজনা ও নিরতিশয় আবেগে উচ্চতানে উঠছিল, তখনই যেন তা বহুভাঁজ বজ্রপাতে ভেঙে পড়ছিল, বৃক্ষকাণ্ড ও পাহাড়ের গায়ে ধাক্কা মেরে নীচের উপত্যকার দিকে গড়িয়ে যাচ্ছিল। "আমাদের কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নেই, আমাদের কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নেই!" বিলাপ করতে করতে হঠাৎই দার্শনিক স্তব্ধ হয়ে গেলেন। তখনই তাঁর পায়ের কাছে উপর থেকে কিছু একটা খসে পড়ল— হয়ত কোনো দেবদারুফল। দার্শনিকের কুকুরটি জোরে ডেকে উঠে সেই পতিত বস্তুটির উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। সেই আওয়াজে ধ্যানভঙ্গ হয়ে দার্শনিক মাথা তুললেন, আর তাঁর অনুভব জুড়ে রাত্রি-শৈত্য-নিঃসঙ্গতা জেঁকে বসল। তিনি তাঁর সহচরের দিকে তাকিয়ে বললেন, "আরে, আমরা এখানে কী করছি? অন্ধকার নেমে এসেছে। জানোই তো কার জন্য আমরা অপেক্ষা করছি, কিন্তু সে আর এখন

আসবে না। মিছেই আমরা এখানে এত দেরী করলাম। আমাদের এখন যাওয়া উচিত।”...

[(অনুবাদককৃত সন্নিবেশ:) দার্শনিক ও তাঁর সহচরের মধ্যে এই কথোপকথনের দুজন শ্রোতা প্রথম থেকেই হাজির ছিল। রাইন নদীর ধারে পাহাড়ের উপর অরণ্যের মাঝে তাঁদের থেকে কিছুটা দূরত্ব ও আড়াল বজায় রেখে তারা একাগ্র মনেই সব শুনছিল। জিমনাসিয়ামের উপরের দিকের ছাত্র তারা। তাদের একজনেরই বয়ানে এই গোটা উপস্থাপনাটি হাজির হচ্ছে। দার্শনিকের কথা তাদের মনে আলোড়ন তুলেছিল, তাদের মনে হচ্ছিল যে চোখের সামনে থেকে একের পর এক পর্দা উঠে গিয়ে ভাবনার নানা নতুন উত্তেজনাকর দিগন্ত তাদের সামনে যেন উন্মোচিত হয়ে চলেছে। দার্শনিক ও তাঁর সঙ্গী সেই জায়গা ছেড়ে চলে যেতে উদ্যত হতেই তারা তাদের আড়াল থেকে বেরিয়ে এসে দার্শনিককে তাদের উপলব্ধির কথা জানাতে যায়। দার্শনিক ও তাঁর সহচর সেই ঘনায়মান অন্ধকারে হঠাৎ দুজনের হাজির হওয়ায় হতচকিত হয়ে পড়ে। ক্রমশ অবশ্য থিতু হয়ে তাদের মধ্যে কথাবার্তা শুরু হয়। ছাত্র দুজন দার্শনিকের বক্তব্যে সহমত পোষণ করতে চাইলেও তাদের কথাবার্তা থেকে দার্শনিকের কেবলই মনে হতে থাকে যে তারা তাঁর বক্তব্য আসলে সঠিকভাবে বুঝতে পারেনি। তাঁর রুষ্টতাও প্রকাশ পায়। তারপর কথোপকথন বাঁক নেয় এইদিকে:]

...দার্শনিক হঠাৎ আমাদের দিকে ঘুরে কিছুটা কোমল স্বরে বললেন, “তোমাদের মতো তরুণরা বিশদ চিন্তা না করেই হঠকারী আচরণ করলে আমার অবাক হওয়া সাজে না। কারণ সদ্য তোমরা আমার মুখ থেকে যা শুনলে, তেমন কোনো বিষয় নিয়ে গভীরভাবে ভাবার সুযোগ তোমাদের খুব একটা হয় না। নিজেদের কিছুটা সময় দাও, যা আমি বললাম তা সঙ্গে করে কিছুদিন বহন কর, দিনরাত তা নিয়ে ভাবো। তোমাদের সামনে পথ এখন দুভাগ হয়ে গেছে, এখন তোমরা জানো এই দুই পথের কোনটা কোনদিকে গেছে।

“একটা পথ ধরে এগোলে তোমাদের যুগ সাদরে তোমাদের বরণ করে নেবে, সম্মান-প্রশস্তি-পদকের অভাব ঘটবে না, বিরাট দঙ্গল তোমাদের ঘাড়ে করে বয়ে নিয়ে এগিয়ে চলবে, সামনে পিছনে সমমনস্কদের ভিড় তোমাদের ঘিরে থাকবে, সামনের কেউ কোনও কথা উচ্চারণ করলে প্রত্যেকটা কন্ঠ থেকে তার প্রতিধ্বনি উঠবে। এই পথে কর্তব্য হল দুটো— প্রথম কর্তব্য হল সারিতে দাঁড়িয়ে শৃঙ্খলা

বজায় রেখে লড়ে যাওয়া, আর দ্বিতীয় কর্তব্য হল শৃঙ্খলাপরায়ন হয়ে সারিতে দাঁড়াতে কেউ অস্বীকার করলেই তাকে ধরেবেঁধে বিনাশ করা।

"আর যদি অন্য পথ ধরে চল, খুব কমই সহযাত্রী মিলবে। সেই পথও অনেক খাড়াই, অনেক আঁকবাঁকে ভরা, অনেক দুর্গম; আর প্রথম পথের পথিকরা সর্বক্ষণ তোমাকে পরিহাস করবে, বিদ্রূপ করবে কারণ তাদের তুলনায় তোমার যাত্রা কত শ্রমসাধ্যই না হবে! সেই প্রথম পথের পথিকরা সর্বদা তোমাকে তাদের পথে টেনে নেওয়ার জন্য প্রলোভনও তৈরি করবে। আর যখনই দুটি পথ কোনো বিন্দুতে এসে মিলবে, তখনই হয় তোমার সঙ্গে দুর্ব্যবহার করে তোমাকে ঠেলে সরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা হবে আর নয়ত তোমাকে ভয় করে তারা দূরে সরে থাকবে।

"এখন এই দুই ভিন্ন পথের পথিকরা 'শিক্ষা প্রতিষ্ঠান' বলতে কী বোঝে? প্রথম পথে বিপুল দঙ্গল বেঁধে যারা হুড়মুড়িয়ে তার গন্তব্যে পৌঁছতে চাইছে, তাদের কাছে 'শিক্ষা প্রতিষ্ঠান' মানে হল এমনই এক প্রতিষ্ঠান যা তাদের শৃঙ্খলাপরায়ন সারিতে ঢুকিয়ে দিয়ে ধরে রাখে এবং উচ্চতর বা অধিকতর দূরবর্তী লক্ষ্য অভিমুখে কঠোর চেষ্টায় ব্রতী যে কোনো কাউকে বাতিল ও বহিষ্কার করে। স্বাভাবিকভাবেই এই দঙ্গল জানে কীভাবে চমৎকার শব্দাবলীতে সাজিয়ে তাদের অভিপ্রায় হাজির করতে হয়। যেমন ধরা যাক, তারা 'নির্ধারিত, অংশভাগী, জাতীয়, সাধারণ মানবিক নীতির অধীনে ব্যক্তিসত্তার সার্বিক বিকাশ'-য়ের বুলি কপচাতে পারে, বা 'যুক্তি, সংস্কৃতি ও ন্যায়ের ভিত্তিতে জনগণতন্ত্র গড়ে তোলা'-র লক্ষ্য ঘোষণা করতে পারে।

"দ্বিতীয় পথের গুটিকয় যাত্রীদের কাছে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মানে সম্পূর্ণ ভিন্ন। তারা চায় এমন একটা শক্তপোক্ত কাঠামো যা তাদের উপর প্রথম পথের দঙ্গলের নিয়ত হানাদারি চালিয়ে ছত্রখান করার চেষ্টার বিরুদ্ধে ঢাল হিসেবে কাজ করতে পারে, যাতে সহযাত্রী কোনো ব্যক্তি হামলার মুখে বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়ে অকাল অবসাদের কোপে নিজ মহান উন্নত ব্রত থেকে বিচ্যুত হয়ে ধ্বস্ত বিকৃত না হয়ে পড়ে। তাদের বিবেচনায় কোনো সাধারণ প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্যই হল ব্যক্তিকে তার নিজ কাজ সমাপনে সাহায্য করা— কিন্তু সেই কাজ এমন যা আত্মভাবের কণামাত্র থেকে মুক্ত, যা যুগের নিত্যপরিবর্তনশীল ক্ষণস্থায়ীত্বের উপরে উঠে বস্তুসমূহের চিরায়ত অপরিবর্তমান প্রকৃতিকে নিখাদভাবে প্রতিফলিত করে। সেই প্রতিষ্ঠানের ব্যক্তিবিশেষরাও আত্মভাব মুক্ত হয়ে জিনিয়াসের জন্ম ও জিনিয়াসের সৃষ্টির পথ তৈরি করতে সর্বপ্রচেষ্টা নিয়োগ

করবে। এহেন সহযোগী ভূমিকা নিতে দ্বিতীয় বা তৃতীয় স্তরের মেধা নিয়েও বহুজনই পারঙ্গম হতে পারে, আর, এই ধরনের প্রকৃত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কাজ করার মধ্য দিয়েই তারা তাদের জীবনকর্তব্যপালনের পূর্ণতাবোধে পৌঁছতে পারে।

"আজকালকার দিনে অবশ্য ফ্যাশনদুরস্ত 'সংস্কৃতি'-র নিত্য প্রলোভন সেই রকম মেধার মানুষদের বিপথে চালিত করে, ফলে তারা নিজ প্রবৃত্তি থেকে বিচ্ছিন্ন অবস্থায় অকূলে ভেসে বেড়ায়। তাদের আত্মম্ভরী তাড়না, দুর্বলতা ও অহংকারকে নিশানা করে নানা প্রলোভন আক্রমণ হানে, যুগের হাওয়া তাদের কানে মন্ত্রণা দেয়: 'আমাকে অনুসরণ কর! ওই অন্য পথে তোমাদের ভৃত্য হয়ে থাকতে হবে, সহযোগী বা হাতিয়ারবিশেষ হয়েই থাকতে হবে, উচ্চতর প্রকৃতির কিরণে তোমরা ঢাকা পড়ে থাকবে, নিজ ব্যক্তিভাবকে উপভোগ করার স্বাধীনতা কখনও পাবে না; দাসের মতো বা যন্ত্রের মতো তোমায় দড়িতে-শিকলে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে রাখবে! আর এখানে আমার সঙ্গে এলে, তোমার ব্যক্তিত্বের সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ থাকবে তোমার হাতেই, তোমার মেধা নিজ গৌরবে উজ্জ্বল হয়ে উঠবে, তুমি— হ্যাঁ তুমিই— প্রথম সারিতে অধিষ্ঠিত হবে। বিপুল সংখ্যক অনুগামী সবসময় তোমার চারদিকে ভিড় করে থাকবে; জনকণ্ঠের উচ্চরব স্তুতি যে তৃপ্তি তোমায় এনে দেবে তা উচ্চে উপবিষ্ট কোনো জিনিয়াসের অভিজাত প্রশংসাবাক্য থেকে কখনওই মিলবে না।' আজকের সবচেয়ে ভালো মানুষটিও এই প্রলোভন এড়াতে পারে না। এর ব্যত্যয় করতে হলে প্রকৃতপক্ষে যা দরকার তা ওই মানুষটির মেধার মধ্যে নেই, চলতি হাওয়ার কথায় কান দেওয়া বা না দেওয়ার মধ্যেও নেই, তা আছে এক প্রকার নৈতিক উচ্চতার মধ্যে, বীরভাব ও আত্মোৎসর্গপ্রবণ প্রবৃত্তির মধ্যে, আর সর্বোপরি প্রকৃত শিক্ষার মধ্য দিয়ে উদ্বোধিত এমন এক ভিত্তিপ্রস্তরের মধ্যে যা সংস্কৃতির জন্য অবশ্যপ্রয়োজনীয়। আমি আগেই বলেছি যে এই ভিত্তিপ্রস্তরের মানে হল সর্বাগ্রে জিনিয়াসতন্ত্রের প্রতি আনুগত্য ও আত্মনিবেদনকে একধরনের নৈতিক আবশ্যকীয়তায় পরিণত করা।

"কিন্তু আমাদের এই সময়ের তথাকথিত 'শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো' জিনিয়াসতন্ত্র বা তার প্রতি আনুগত্য-আত্মনিবেদন সম্পর্কে মূলগতভাবে কিছুই জানে না, যদিও সন্দেহ নেই যে তাদের সূচনাকালে জিমনাসিয়ামগুলোর উদ্দেশ্য ছিল প্রকৃত শিক্ষাকে লালন করা, বা, অন্তত, প্রকৃত শিক্ষা গ্রহণের জন্য শিক্ষার্থীদের প্রস্তুত করে তোলা। আর ওই উদ্দেশ্য সাধন করার পথে

জিমনাসিয়ামগুলো প্রাথমিক কয়েকটি সাহসী পদক্ষেপও ফেলেছিল পুনর্গঠনের সেই বিস্ময়কর গভীর আবেগমথিত যুগে। কত না লজ্জাকরভাবেই সেই উদ্দেশ্যকে বিপথগামী করে আড়ালে ঢেকে ফেলা হয়েছিল তারপর, আর আমাদের গ্যেটে ও শিলারের সময়কালেও সেই দুরবস্থা থেকে তার কিছু অংশের পুনরুদ্ধার ঘটতে আমরা দেখেছি, যার তুলনা করা যায় ফেদ্রাস-য়ে[৩৯] প্লেটো কথিত সেই ডানার প্রথম অঙ্কুরোদ্গমের সঙ্গে যা কিনা সুন্দরের প্রতিটি স্পর্শের সঙ্গে সঙ্গে আত্মাকে উড়িয়ে নিয়ে যায় বস্তুরাজির নিখাদ অপরিবর্তনীয় আকারের জগতের দিকে।"

দার্শনিকের সঙ্গী বলে উঠলেন, "সম্মানীয় শিক্ষাগুরু, এই যে আপনি ঐশ্বরিক প্লেটো এবং ভাবনার জগতের আবাহন করলেন, আমার মনে হয় না যে আমার কথাবার্তা আগে আপনাকে যতই রাগত ও নারাজ করে থাকুক না কেন, এখন সত্যিই আপনি আমার উপর রেগে আছেন। আপনি কথা বলতে শুরু করার সঙ্গে সঙ্গেই আমি নিজ অভ্যন্তরে প্লেটো-কথিত ডানার নড়াচড়া টের পেতে শুরু করেছিলাম। প্লেটো এক ঘোড়ারও বর্ণনা করেছিলেন—যেমনতেমন করে গড়ে তোলা এক বাঁকাচোরা এলোমেলো জন্তু, খাটো মোটা ঘাড়, থ্যাবড়া মুখ, কৃষ্ণবর্ণ, ধূসর রক্তবর্ণ চোখ, বধির লোমশ কান, অনর্থ ও অসম্মান ঘটাতে উদ্যত, চাবুক বা অশ্বারোহীর জুতোর কাঁটার আঘাতও যাকে পোষ মানাতে বেগ পায়। যখন আপনি কথাশেষে স্তব্ধ হয়েছিলেন, আমার আত্মার সারথি সেই ঘোড়াকে বশে আনতে নাজেহাল হয়ে উঠেছিল।

"খেয়াল করে দেখুন কত না লম্বা সময় আমি আপনার সঙ্গ পাইনি, আর যে প্রলুব্ধকারী ছলাকলাগুলো আপনি বর্ণনা করলেন, সেগুলো আমাকেও তাদের নিশানা করেছিল। আমি নিজে হয়ত খেয়াল করিনি, কিন্তু সেইসব প্রলোভনের প্রভাব থেকে আমিও পুরো রেহাই পাইনি। এখন আমি আরো স্পষ্ট করে বুঝতে পারছি এমন একটা প্রতিষ্ঠান থাকা কত না গুরুত্বপূর্ণ যেখানে প্রকৃত সংস্কৃতিধারী বিরল মানুষদের সঙ্গে একত্রে থাকা সম্ভব হয় ও তাদেরকে নেতা ও পথপ্রদর্শক হিসেবে সামনে পাওয়া যায়। একাকী পথে-বিপথে এলোমেলো ঘুরে বেড়ানো কতই না বিপজ্জনক! যুগের হাওয়ার হুড়োহুড়ি-হৈ-হট্টগোলের স্পর্শ এড়িয়ে পালিয়ে বাঁচার কথা ভেবেছিলাম, সেকথাই আপনাকে বলেছিলাম, সে যে কেবল ফাঁকিবাজি তা এখন বুঝছি। চলতি যুগের হাওয়া আমাদের প্রতিটি নিশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে অসংখ্য শিরা-ধমনী বেয়ে আমাদের গোটা দেহে শোষিত হয়ে যাচ্ছে, কোনও একাকীত্বই এতটা বিজন বা এতটা সুদূর নয় যে সেই কুজ্ঝটিকার

নাগাল এড়াতে পারে। ওই তথাকথিত সংস্কৃতির প্রতিরূপ নিত্যপরিবর্তনশীল নানা ছদ্মবেশে আমাদের চারদিক থেকে ছেঁকে ধরেছে— কখনও সন্দেহর বেশে, কখনও মুনাফার বেশে, কখনও আশার বেশে, আবার কখনও সদ্‌গুণের বেশে— এমনকি এখন এখানে আপনার মতো প্রকৃত সংস্কৃতির এক প্রবক্তার সান্নিধ্যেও ওই প্রলুব্ধকারী ছলাকলা পুরোপুরি তার শক্তি হারায় না। প্রকৃত সংস্কৃতির ক্ষুদ্রসংখ্যক পথযাত্রী, জোট বেঁধে একে অপরকে রক্ষা করা ছাড়া যাদের গতি নেই, কত না স্থিরসংকল্প, সত্যনিষ্ঠ ও সদাসতর্ক তাদের হতে হয়! কীভাবে না তাদের একে অপরকে শক্তি ও সাহস যোগাতে হয়! প্রতিটা ভুল পদক্ষেপকে কত না নির্দয়ভাবে কাটাছেঁড়া করতে হয়, আবার কত না সহানুভূতির সাথে তা মার্জনা করতে হয়! শিক্ষাগুরু, অত্যন্ত কঠোরভাবে আপনি আমাকে ভর্ৎসনা করেছেন, দয়া করে এখন আমাকে মার্জনাও করুন!"

দার্শনিক জবাবে বললেন, "প্রিয় বন্ধু আমার, যে ভাষায় তুমি কথা বলছ তা আমার পছন্দ হচ্ছে না। মনে হচ্ছে তোমার মুখ থেকে যেন কোনো ধর্মীয় গুপ্ত সমিতির কথাবার্তা বেরচ্ছে— তেমন কোনো সংসর্গে আমি থাকতে চাই না। কিন্তু তোমার প্লেটোনিক ঘোড়াটিকে আমার বেশ পছন্দ হয়েছে, তার সৌজন্যেই আমি তোমায় মার্জনা করছি। তোমার ওই ঘোড়াটিকে আমি নেব, বিনিময়ে আমার দুগ্ধপোষ্য মেষশাবকটি তোমায় দিচ্ছি।[৪০]" ...

...দার্শনিক তারপর আমাদের দিকে ফিরে বললেন, "তোমরা যদি মন দিয়ে এতক্ষণ সব শুনেই থাকো, তাহলে বল না কেন যে আমি এতক্ষণ যা বললাম তা মাথায় রাখলে জিমনাসিয়ামের মূল উদ্দেশ্য কী হওয়া উচিত বলে তোমাদের মনে হয়? তাছাড়া, তোমরা এখনও ওই প্রতিষ্ঠানের ঘন সান্নিধ্যে আছ, ফলে তোমাদের অভিজ্ঞতা ও ধারণা দিয়ে আমার বক্তব্যের যাথার্থ্য নিশ্চয়ই তোমরা বিচার করতে পারবে।"

আমার বন্ধু তার নিজস্ব ঝটপটে ভঙ্গিতে জবাব দিল: "আজ অবধি আমরা বিশ্বাস করে আসছিলাম যে জিমনাসিয়ামের উদ্দেশ্য হল শিক্ষার্থীদের বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য প্রস্তুত করে দেওয়া। এই প্রস্তুতি বিশ্ববিদ্যালয় পড়ুয়াদের অসাধারণ স্বাধীনতা উপভোগ করার মতো যথেষ্ট স্বাবলম্বী করে দেবে আমাদের— কারণ, আমার মনে হয় যে বিশ্ববিদ্যালয় পড়ুয়ার মতো এত সিদ্ধান্তগ্রহণের স্বাধীনতা ও কাজের স্বাধীনতা আজকের সমাজে আর কোনও বর্গের মানুষেরই মেলে না। সামনে তার জন্য সম্পূর্ণ উন্মুক্ত এক বিস্তীর্ণ প্রান্তর,

সেখানে বহু বছর ধরে তাকে নিজেই নিজের পথপ্রদর্শক হতে হবে। তাই জিমনাসিয়ামের কাজ হল তাকে স্বাধীন ও স্বয়ংসম্পূর্ণ করে তোলা।"

বন্ধুর কথার সূত্র ধরে আমি বললাম: "আমার মনে হয় যেসব বিষয়ে জিমনাসিয়ামের সমালোচনা আপনি করেছেন এবং সঠিকভাবেই করেছেন, সেগুলো আসলে শিক্ষার্থীদের মধ্যে এক প্রকার স্বাধীনতা বা অন্তত স্বাধীনতার প্রত্যয় পরিপুষ্ট করার জন্যই দরকারী। খানিকক্ষণ আগে আপনি যে জার্মান প্রবন্ধ রচনা নিয়ে বলছিলেন, সেই প্রবন্ধ রচনারও তো উদ্দিষ্ট লক্ষ্য তাই: নিজ স্বাধীন মতামত ও নিজ স্বাধীন লক্ষ্য লালন করার আনন্দের স্বাদ ব্যক্তি-পড়ুয়াদের দেওয়া দরকার যাতে পরবর্তীকালে তারা কোনও খঞ্জের যষ্ঠি ছাড়াই নিজ পায়ে হাঁটতে পারে। সেই জন্যই পড়ুয়াদের অত অপরিণত অল্প বয়সেই নিজে প্রবন্ধ লিখতে এবং আরও অল্প বয়সেই তীক্ষ্ণ বিচার-সমালোচনা করতে উৎসাহিত করা হয়। লাতিন ও গ্রিক শিক্ষা দূর পুরাকালের জন্য কোনও আবেগ যদি না জাগাতে পারে, তাহলেও এখনকার পঠনপাঠনপদ্ধতি অন্ততপক্ষে বিদ্যাচর্চার মানসিকতা, পুরোদস্তুর কারণিক জ্ঞান, উন্মোচন ও আবিষ্কারের আবেগ জাগাতে পারে। জিমনাসিয়ামে পঠনের এক নতুন পদ্ধতি খুঁজে পেয়ে তাদের তরুণ আঙুলগুলো দিয়েই তাকে আঁকড়ে ধরার ফলে কত না পড়ুয়া চিরদিনের মতো বিদ্যায়তনিক অধ্যয়নের মোহিনী-শক্তিতে বাঁধা পড়েছে! জিমনাসিয়ামে একজন পড়ুয়াকে সব ধরনের বিষয় পড়তে হয়, সব ধরনের জ্ঞান আহরণ করতে হয়, আর সম্ভবত সেই জন্যই তার মধ্যে অল্প অল্প করে অধ্যয়ন ও আহরণের প্রবৃত্তি গড়ে ওঠে, যা সে বিশ্ববিদ্যালয়ে গিয়ে স্বাধীনভাবে প্রয়োগ করতে পারে। অন্যভাবে বললে, আমরা মনে করি যে জিমনাসিয়ামের উদ্দেশ্য হল পড়ুয়াদের এমনভাবে তৈরি করে দেওয়া যাতে জিমনাসিয়াম-ব্যবস্থায় যেভাবে তাকে দিনযাপন ও অধ্যয়ন করতে বাধ্য করা হয়েছিল, সেভাবেই যেন পরবর্তীকালে সে দিনযাপন ও অধ্যয়ন স্বাধীনভাবে চালিয়ে যেতে পারে।"

আমাদের কথা শুনে দার্শনিক হেসে উঠলেন, সে হাসি পুরো নির্মল নয়, বক্রতার ঝলক-কাটা হাসি, আর বললেন, "আর স্বাধীনতার কত না দারুণ এক দৃষ্টান্ত তোমরা আমার সামনে এখানে পেশ করলে! ঠিক সেই স্বাধীনতা যা আমার বীভৎস লাগে, যার জন্য আজকালকার পড়ুয়াদের কাছে ঘেঁষাও এত অপ্রীতিকর হয়ে উঠেছে! অবশ্যই, আমার প্রিয় বন্ধুরা, তোমাদের প্রস্তুতি সম্পন্ন, তোমরা পরিপক্ক, তোমরা স্বয়ংসম্পূর্ণ— তোমাদের তৈরি করার পর প্রকৃতিদেবী সেই ছাঁচ ভেঙে ফেলেছেন, আর তোমাদের শিক্ষকদের তোমাদের অস্তিত্ব নিয়ে গর্ব

করার সর্বৈব অধিকার আছে। কত না স্বাধীনতা, নিশ্চয়তা ও আত্মবিশ্বাস তোমাদের বিচার-বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে ঝরে পড়ছে! কত না অভিনব ও টাটকা তোমাদের অন্তর্দৃষ্টি! তোমরা বিচার করতে বস আর সব যুগের সব সংস্কৃতি তোমাদের সামনে ছত্রখান হয়ে ছড়িয়ে পড়ে; তোমাদের বিদ্যোৎসাহ চাগাড় দেয় আর সঙ্গেসঙ্গে তোমাদের আঙুল থেকে আগুন ঝরতে থাকে— ত্রস্তসমস্ত হয়ে সবাইকে সেই আগুনে দগ্ধ হওয়া থেকে নিজেকে বাঁচাতে হয়! আর তোমাদের অধ্যাপকগণ— তাঁরাও তো স্বাধীনতায় কম যান না, বরং তাঁরা স্বাধীনতাকে আরো বলদৃপ্ত ও মোহিনী স্তরে নিয়ে গেছেন। আজকের মতো আগে আর কোনো যুগ তো জাঁকালো স্বাধীনতার এমন প্রদর্শনীতে এত ঋদ্ধ হয়ে ওঠেনি, যে কোনো ধরনের দাসত্বও এত ঘৃণার বিষয় হয়ে ওঠেনি— অবশ্য তার মধ্যে শিক্ষার দাসত্ব ও সংস্কৃতির দাসত্বও আছে!

"তবু, তোমাদের কাছ থেকে একবার অনুমতি চেয়ে নিচ্ছি তোমাদের এই স্বাধীনতাকে সেই প্রকৃত শিক্ষা ও সংস্কৃতির মাপকাঠিতে বিচার করার জন্য। দেখা যাক সেই বিচারে তোমাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলো কী স্থান পায়। যখন বিদেশের কেউ আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়-ব্যবস্থা সম্পর্কে আরো জানতে চায়, প্রথমেই সে যে প্রশ্নটায় জোর দেয়, তা হল; তোমাদের ছাত্রছাত্রীরা কীভাবে বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে সংযুক্ত থাকে? আমরা উত্তর দিই: কানের সূত্রে যুক্ত থাকে, বিশ্ববিদ্যালয় জীবন তারা শ্রোতা হিসেবে অতিবাহিত করে। বিদেশী অবাক হয়ে আবার প্রশ্ন করে: কেবলমাত্রই শ্রোতা হিসেবে? আমরা পুনরায় বলি: কেবলমাত্র শ্রোতা হিসেবে। ছাত্রছাত্রীরা ক্লাসের লেকচারে উপস্থিত থাকে। বাকি আর সব কাজে— কথা বলা, হাঁটা, অন্যদের সঙ্গে সময় কাটানো, বা, শিল্পসৃজন করা— সংক্ষেপে, জীবনের প্রতিটি শ্বাসপ্রশ্বাসে— সে স্বাধীন, অর্থাৎ, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের উপর নির্ভরশীল নয়। এখন এমনটা প্রায়শই ঘটে যে লেকচার শুনতে শুনতে ছাত্র বা ছাত্রীটি কিছু টুকে রাখল। সেই মুহূর্তগুলোতেই সে এক প্রকার নাড়ির বন্ধনে বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে বাঁধা পড়ে। সে কি শুনতে চায় তা বাছাই করার অধিকার তার আছে, যা শুনছে তা-ই বিশ্বাস করতে হবে এমন কোনো মাথার দিব্যি নেই, শুনতে না চাইলে সে তার কানদুটোকে বন্ধও করে রাখতে পারে। একে শিক্ষাদানের 'বর্ণবিকারহীন' পদ্ধতি বলা যেতে পারে।

"সুতরাং শিক্ষকরা এই শ্রবণরত ছাত্রছাত্রীদের উদ্দেশ্যে ভাষণ দেন। শিক্ষক আর যা ভাবুন বা করুন না কেন, তা গভীর এক খাদের ওপারে তাঁর ছাত্রছাত্রীদের নাগালের বাইরে থেকে যায়। ভাষণ দেওয়ার সময় প্রায়শই শিক্ষক

কিছু না কিছু পাঠ করে থাকেন। সাধারণত, তিনি যত বেশি সম্ভব শ্রোতা চান, কিন্তু প্রয়োজন হলে অল্পসংখ্যক শ্রোতাতেও তিনি কাজ চালিয়ে যান, যদিও সেই অল্প সংখ্যার মানে কখনোই একজন শ্রোতা নয়। একটি ভাষণরত কন্ঠ এবং অনেকগুলো কান আর তার অর্ধসংখ্যক লিখনরত হাত: বাইরে থেকে দেখলে এই হল বিদ্যায়তনিক ব্যবস্থা বা বিশ্ববিদ্যালয়ের চালু শিক্ষাযন্ত্র। আর ওই কন্ঠের মালিক ওই অতগুলো কানের মালিকদের থেকে বিচ্ছিন্ন ও স্বাধীন।

"এই দ্বি-ভাঁজ স্বাধীনতাকে 'বিদ্যায়তনিক স্বাধীনতা' নামে মহান করে দেখানো হয়। এই স্বাধীনতাকেই যারপরনাই আরো প্রসারিত করতে কন্ঠধারী কমবেশি যা খুশি বলে যেতে পারে, আর কর্ণধারীরাও হাজির হওয়া শ্রবণবস্তুর কমবেশি যা যতটুকু শুনতে চায় শুনতে পারে— কেবল পশ্চাদপটে উভয়পক্ষের থেকেই শোভনীয় দূরত্ব বজায় রেখে দেখভালকারী নজর জাগর করে রাষ্ট্র দণ্ডায়মান থাকে আর মাঝে মধ্যে সবাইকে স্মরণ করিয়ে দেয় যে এই ভাষণ-শ্রবণের অদ্ভুত প্রক্রিয়ার লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও সারবস্তু হল রাষ্ট্র স্বয়ং।

"এই বিস্ময়কর প্রতীতিকে নিখাদ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বলে গণ্য করতে যারা আমরা বাধ্য, অতঃপর তারা যে কোনও জিজ্ঞাসু বিদেশীকে এটাই জানাব যে আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলো যাকে 'শিক্ষা' ও 'সংস্কৃতি' বলে, তা মুখ থেকে কানে প্রবাহিত হয় এবং যেকোনো শিক্ষাদানপ্রক্রিয়াই হল, যা বলেছি, 'বর্ণবিকারহীন'। কিন্তু যেহেতু শ্রবণকার্য এবং কী শোনা হবে তা বাছাই করাও স্বাধীনচেতা পড়ুয়াদের ব্যক্তিগত বিচারের বিষয়, যেহেতু সেই পড়ুয়া কান দিয়ে গ্রহণ করা যে কোনো কিছুকেই বিশ্বাস করতে নারাজ হতে পারে, কোনো মান্যতা না দিতে পারে, তাই শিক্ষাপ্রক্রিয়াটা আদপে পড়ুয়ার নিজের হাতেই ছাড়া রয়েছে। জিমনাসিয়ামগুলো যে স্বাধীনতা উৎপাদন করার আয়াস নিয়েছিল, তা এখন বহুবর্ণ উজ্জ্বল পুচ্ছ ধারণ করে 'স্বাধীন উচ্চশিক্ষা' রূপে নিজেকে জাহির করে সদর্পে ঠাট দেখিয়ে বেড়াচ্ছে।

"কত না আনন্দময় এ যুগ যেখানে শিশুরা নিজেরাই নিজেদের হাঁটা শেখাতে পারার মতো প্রাজ্ঞ ও শিক্ষিত! অন্যান্য সব যুগ যখন নির্ভরশীলতা, শৃঙ্খলা, অধীনতা ও বাধ্যতা অনুশীলন করায় আস্থা রেখে স্বাধীনতার সর্বপ্রকার ভ্রমকে সর্বশক্তি দিয়ে প্রতিহত করার চেষ্টা করত, তখন স্বাধীনতার অনুশীলনকারী আমাদের জিমনাসিয়ামগুলো কতই না অতুলনীয়! প্রিয় বন্ধুরা, এখন কি তোমরা বুঝতে পারছ কেন আমি শিক্ষার দৃষ্টিকোণ থেকে বর্তমান বশ্বিবিদ্যালয়গুলোকে নেহাতই জিমনাসিয়ামের প্রসারণ হিসেবে গণ্য করি? কোনো তরুণ ব্যক্তির মধ্যে

মূর্ত রূপ ধারণ করে থাকা জিমনাসিয়ামের শিক্ষা বিশ্ববিদ্যালয়ের দরজা দিয়ে সদর্পে প্রবেশ করে নিজের সম্পূর্ণতা ও সমগ্রতা সম্পর্কে সুনিশ্চিত হয়ে থাকে, তার নিজস্ব উচ্চাভিলাষ ঠিকরে ঠিকরে বের হয়: দাবি জানাতে জানাতে, আইন বানাতে বানাতে, বিচারের রায় দিতে দিতে সে এগিয়ে চলে। সুতরাং জিমনাসিয়ামের স্নাতককে হেলাফেলা নয়: শিক্ষার বরপ্রাপ্ত বলে আত্মবিশ্বাসী সেই স্নাতক তার শিক্ষকদের হাতে গড়া স্কুলছাত্রটিই থেকে যায়। জিমনাসিয়াম ছাড়ার পর বিদ্যায়তনিক বিজনতায় সে এখন উপদেশ-নির্দেশের গঠনমূলক স্তরের ঊর্ধ্বে সম্পূর্ণ স্বাধীন ও স্বনির্ভর হয়ে বিরাজ করছে।

"স্বাধীন! মানব প্রকৃতি সম্পর্কে বিশেষজ্ঞ হে বন্ধুরা, এই স্বাধীনতাকে একবার পরীক্ষার মুখে ফেলে দেখবে নাকি! বর্তমান জিমনাসিয়াম শিক্ষার নরম মাটিতে ভঙ্গুর ভিতের উপর গড়ে তোলা এই স্বাধীনতার সৌধ বাঁকাচোরা হয়ে দাঁড়িয়ে আছে, ঘূর্ণি ঝড়ের নিশ্বাসটুকুও তাকে উপড়ে ফেলবে। এই স্বাধীন পড়ুয়ার দিকে একবার ভালো করে চেয়ে দেখ, স্বাধীন উচ্চশিক্ষার হে অগ্রগামী দূত, তার প্রবৃত্তি থেকে তাকে অনুমান কর, তার প্রয়োজনগুলো থেকে তাকে জানো! তার দর্শনের প্রয়োজন, চারুকলার প্রবৃত্তি, আর, শেষত, সমস্ত সংস্কৃতির যা সুনিশ্চিত আবশ্যক সেই গ্রিক ও রোমীয় পুরাকালের মানদণ্ড— এই তিন মাপকাঠিতে মাপলে তার শিক্ষা কী দাঁড়ায়?

"গুরুতর কঠিন সমস্যায় আমরা এতটাই পরিবৃত যে সেগুলোর সমাধানে ব্রতী হলেই দ্রুত দার্শনিক বিস্ময় আমাদের আচ্ছন্ন করে। একমাত্র এই উর্বর মাটিতেই গভীরতর উচ্চতর শিক্ষা বেড়ে উঠে ডালপালা মেলতে পারে। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে, একজন ব্যক্তির নিজস্ব অভিজ্ঞতাই তাকে এহেন সমস্যার মুখোমুখি এনে দাঁড় করায়। প্রাত্যহিক তুচ্ছতার দৃষ্টান্ত হিসেবে, আবার একই সঙ্গে এক চিরায়ত রহস্যাবৃত নাছোড় সমস্যার দৃষ্টান্ত হিসেবে: এই দুজোড়া প্রতিফলনে প্রায় প্রতিটি ব্যক্তিগত ঘটনাই ঝিকমিক করে জ্বলতে থাকে বিশেষ করে তারুণ্যের ঝঞ্ঝাবহুল সময়কালে। সেই বয়সে নিজের অভিজ্ঞতাগুলোর চারদিকে আধিবিদ্যক রামধনুর বলয় তৈরি হয়, আর তাই তখন পথপ্রদর্শকের সান্নিধ্য সবচেয়ে জরুরী হয়ে ওঠে। একজন তরুণ হঠাৎই প্রায় প্রবৃত্তিগতভাবে অস্তিত্বের দ্ব্যর্থতা সম্পর্কে নিশ্চিত হয়ে উঠতে পারে এবং তার পায়ের নীচে থেকে একদা লালিত মত ও বিশ্বাসের শক্ত জমিটা হঠাৎই সরে যেতে পারে।

"পথপ্রদর্শকের সান্নিধ্যের এই মহা প্রয়োজনটি বড়ই স্বাভাবিক, আবার, আজকের শিক্ষিত যুবদের যে অতিপ্রিয় স্বাধীনতার জন্য গড়েপিটে তোলা হয়,

তার থেকে এর মতো বিপরীত আর কিছু নয়। লাফ দিয়ে 'স্বয়ংসিদ্ধ'-য়ের ঘাড়ে চড়ে বসা 'নবযুগ'-য়ের তরুণ তুর্কিরা এই পথপ্রদর্শকের প্রয়োজনটিকে অবদমন করতে, চূর্ণ করতে বা ঘুরপথে নিয়ে গিয়ে বিকৃত করতে অতি উৎসুক। স্বাভাবিক দার্শনিক প্রবৃত্তিকে এভাবে পক্ষাঘাতগ্রস্ত করার সবচেয়ে জনপ্রিয় উপায় হচ্ছে তথাকথিত 'ঐতিহাসিক শিক্ষা'। এই সম্প্রতিও গোটা বিশ্বে লজ্জাকর খ্যাতি উপভোগ করত যে দার্শনিক চিন্তাব্যবস্থা,[৪১] তা তো দর্শনের আত্মধ্বংসের সূত্র বের করে ফেলেছিল, আর এখন বস্তুবর্গের 'ঐতিহাসিক বিবেচনা'-র নামে কত না দুর্মদ আনাড়িপনা আমাদের দেখে যেতে হচ্ছে— অযৌক্তিককে 'যুক্তিসঙ্গত' বলে প্রমাণ করা হচ্ছে, কালোদের মধ্যেও সবচেয়ে কালোকে 'সাদা' বলা হচ্ছে— দেখেশুনে হেগেলের প্রশ্নকে ব্যঙ্গাত্মকভাবে উদ্ধৃত করতে ইচ্ছা হয়: 'যা যুক্তির বিরুদ্ধে, তা কি বাস্তবিক হতে পারে?' অনুতাপের বিষয় যে বর্তমানে কেবলমাত্র অযৌক্তিক বস্তুই বাস্তবিক হতে পারে, অর্থাৎ, বাস্তব প্রভাব সম্পন্ন হতে পারে— আর, এই অর্থে যা বাস্তবিক তা ব্যবহার করে ইতিহাসকে ব্যাখ্যা করাই হল 'ঐতিহাসিক শিক্ষা'-র সারবস্তু। আমাদের যৌবনকালের দার্শনিক প্রবৃত্তিসমূহ পুত্তলিকৃত হয়ে এই রূপ ধারণ করেছে— আর, আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর আজব দার্শনিকগণ ষড় করে আমাদের তরুণ শিক্ষার্থীদের এতেই বিশ্বাসী করে তুলছে।

"ঐতিহাসিক, প্রকৃতার্থে, ভাষাতাত্ত্বিক বিবেচনাই ধীরে ধীরে হলেও নিশ্চিতভাবে চিরায়ত সমস্যাবলীর গভীর অনুসন্ধানের জায়গা দখল করে নিয়েছে। প্রশ্নটা এখন হয়ে দাঁড়িয়েছে: অমুক বা তমুক দার্শনিক কী ভাবতেন বা কী ভাবতেন না? বা, এমানকি: ধ্রুপদী পাঠবস্তুর অমুক না তমুক পাঠান্তরটি বেশি গ্রহণীয়? বর্তমান বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর দর্শনের পাঠক্রমে এমনই এক খোজা করা দর্শনে নিজেদের ব্যাপৃত রাখতে শিক্ষার্থীদের উৎসাহিত করা হয়। বহু কাল হল আমার বিবেচনায় আমি এহেন বিদ্যাচর্চাকে নেহাত ভাষাবিদ্যার একটি শাখামাত্র হিসেবে দেখতে অভ্যস্ত, এবং এহেন চর্চাকারীরা ভাষাতত্ত্বে দড় কি না সেটুকুই আমি বিচার করি। এর ফলে অবশ্য বিশ্ববিদ্যালয় থেকে দর্শনের পাততাড়ি গুটিয়েছে। আর এর মধ্য দিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংস্কৃতিক মূল্য নিয়ে আমাদের প্রথম প্রশ্নটির মীমাংসা নিশ্চয়ই হয়ে গেছে।

"বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে চারুকলার কী সম্পর্ক— এই প্রশ্নের উত্তরে লজ্জা হলেও আমাদের মানতে হবে যে দুইয়ের মধ্যে বিন্দুবিসর্গ কোনো সম্পর্কই নেই। বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে চারুকলার কোনো চিন্তা, শিক্ষা, প্রচেষ্টা বা তুলনামূলক

বিচারের রেশ খুঁজে পাওয়া যায় না। জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ চারুকলা প্রকল্পগুলোকে এগিয়ে নিয়ে যেতে বিশ্ববিদ্যালয় কখনও গলা তুলে কিছু বলেছে, এমন দাবি পরিহাসছলেও কেউ করবে না। কোনো অধ্যাপকের ব্যক্তিগতভাবে চারুকলার দিকে ঝোঁক থাকতে পারে, অথবা বিশ্ববিদ্যালয়ে কলাতত্ত্বের ধাঁচায় কলা-ইতিহাস রচনাকারীদের জন্য কোনো বিশেষ প্রাধিকার সম্পন্ন পদ প্রতিষ্ঠা করা হতে পারে— তা দিয়ে এর কোনো ব্যত্যয় হয় না যে বিশ্ববিদ্যালয় তার অধীনস্থ তরুণবয়সীদের মধ্যে কোনো কড়া নান্দনিক শৃঙ্খলা আরোপ করতে পারে না এবং চায়ও না। ইচ্ছে বা অনিচ্ছেয় যা ঘটে চলেছে তা-ই ঘটে যেতে দেয়। বিশ্ববিদ্যালয় যে নিজেকে সর্বোচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রূপে দাবি করে থাকে এখানেই তার সবচেয়ে গভীর দুর্বলতাটি প্রকাশ পেয়ে যায়।

"আমাদের 'স্বাধীন' বিদ্বজ্জনেরা দর্শনহীন জীবন যাপন করে, চারুকলাহীন জীবন যাপন করে। তাহলে তাদের আর সেই গ্রিক বা রোমীয়দের নিয়ে কী এসে যায়? গ্রীক বা রোমীয়দের সম্মান করার ভনিতাটুকুও এখন কেউ করে না, দূরবর্তী হতে হতে প্রায় ধরাছোঁয়ার বাইরে এক গরিমাময় অপরিচয়ের সিংহাসনে তারা অধিষ্ঠিত হয়ে আছে। খুব যুক্তিসঙ্গতভাবেই এখনকার বিশ্ববিদ্যালয়গুলো গ্রীক বা রোমীয়দের সম্মান করার সাংস্কৃতিক বোধের প্রতি গুরুত্ব দেয় না, সে বোধ এখন লুপ্তই হয়ে গেছে বলা চলে। আর আমাদের 'স্বাধীন' বিদ্বজ্জনেরা তাদের সাধের ভাষাবিদ অধ্যাপকের পদগুলো প্রতিষ্ঠা করে চলেছে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের চিন্তা-চেতনাকে কেবল ভাষাবিদ্যার ঘেরাটোপে বেঁধে গড়ে তুলতে যাতে তারা আবার জিমনাসিয়ামের ছাত্রদের ওই ভাষাবিদ্যক প্রস্তুতির দায়িত্ব নিতে পারে— এ এমন এক জীবন চক্র যা ফিলোলজিস্টদের নিজেদের কোনো উপকারে আসে না, জিমনাসিয়ামেরও কোনো উপকারে আসে না, কিন্তু যা এই তৃতীয় বারের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজেকে একটি প্রকৃত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসেবে দাবি করাকে নস্যাৎ করে দেয়। কারণ তুমি যদি গ্রিকদের (রোমীয়দের কথা না হয় ছেড়েই দিলাম) বাদ দিয়ে দাও, তারসঙ্গে দর্শন ও চারুকলাকেও বাদ দিয়ে দাও, তাহলে কোন মইটি আর রইল প্রকৃত শিক্ষায় বেয়ে ওঠার জন্য? এসব মই বাদ দিয়েই যদি তুমি বেয়ে ওঠার বাহাদুরি দেখাতে চাও, তাহলে তোমার সকল পাণ্ডিত্য মহাভার হয়ে ঘাড়ে চেপে বসে তোমায় ডুবিয়ে দেবে, উপরে ভেসে উঠে উড়ান জমানোর মতো ডানা দেবে না।

"যদি তুমি সৎ হও, আর সততার সঙ্গে এই তিনটি পরিজ্ঞানকে মান্যতা দাও— অর্থাৎ, যদি তুমি মেনে নাও যে বর্তমান পড়ুয়ারা দর্শনের জন্য অপ্রস্তুত ও

অনুপযোগী, চারুকলার প্রবৃত্তির তাদের বড় অভাব, আর গ্রিকদের তুলনায় তারা কেবল স্বাধীনতার ভ্রান্তিবিলাসে নিমজ্জিত বর্বর বিশেষ— তাহলে তুমি এই পড়ুয়াদের খুব ঘন সান্নিধ্যে আসা এড়াতে চাইলেও, ঘেন্নায় তাদের পরিত্যাগ করে যেতে চাইবে না। কারণ এই পড়ুয়াদের এহেন অবস্থা তাদের নিজেদের দোষে হয় নি। পড়ুয়াদের এই নিদারুণ পরিণতি যাদের দোষে হয়েছে তিরস্কারটা তাদেরই পাওনা।

"অপরাধবোধে ন্যুব্জ নির্দোষ পড়ুয়াদের গোপন ভাষাটা তোমায় বুঝতে হবে, তাহলেই কেবল তারা বাইরে যে স্বাধীনতা প্রদর্শন করে বেড়াতে অত পছন্দ করে, সেই স্বাধীনতার ভিতরের স্বরূপটিকে বুঝতে পারবে। সুসজ্জিত এই তরুণদের একজনও অস্থির করে তোলা, অবসাদ জাগানো, ধন্দে ফেলা, দুর্বল করে দেওয়া শিক্ষার এই সংকটের হাত থেকে রেহাই পায় নি: বাইরে থেকে মনে হতে পারে যে আমলা ও দাসে ভরা পৃথিবীতে সে-ই একমাত্র মুক্ত মানুষ, কিন্তু স্বাধীনতার এই চমৎকার বিভ্রমটির মূল্য প্রতিনিয়ত তাকে দিয়ে যেতে হয় সদা বর্ধমান সংশয় ও যন্ত্রণার বোঝা বয়ে যাওয়ার মধ্য দিয়ে। তার মনে হতে থাকে যে নিজে সে নিজেকে চালিত করতে পারবে না, নিজে নিজের সহায় হতে পারবে না— আর তখনই সে প্রাত্যহিক জীবন ও প্রাত্যহিকতার নিয়মমাফিকতার মধ্যে আশাহীনভাবে ডুব দেয়। সবচেয়ে তুচ্ছ ক্রিয়াকর্মের ব্যস্ততায় সে নিজেকে নিমজ্জিত রাখে আর তার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ক্রমশ ক্লান্ত-দুর্বল হয়ে উঠতে থাকে। তারপর হঠাৎ হয়ত সে গা-হাত-পা ঝাড়া দিয়ে ঘুরে দাঁড়াতে চায়, সতেজ হয়ে ভেসে ওঠার শক্তি জড়ো করে। সুউচ্চ গর্বিত প্রতিজ্ঞা তার মধ্যে দানা বাঁধে। পেশাদারিত্বের সংকীর্ণ গণ্ডিতে অত সাতসকালেই ডুবে মরার ভয় থেকে সে ভেসে যাওয়া আটকাতে খড়কুটো যা পায় আঁকড়ে ধরার চেষ্টা করে। কিন্তু কোনও লাভ হয় না! সে ভুল জিনিষ আঁকড়ে ধরেছিল, স্রোত তাকে ভাসিয়ে নিয়ে যায়। আশাভঙ্গের বেদনা নিয়ে সে দেখে তার সমস্ত পরিকল্পনাই বিফল হয়ে গেছে, অপদস্থ অসুস্থ বোধ করে, আর, অতিরঞ্জিত ব্যস্ততা ও অবসন্ন নিষ্ক্রিয়তার মধ্যে দোল খেতে থাকে। ক্লান্তি, আলস্য, কাজের ভীতি, আত্মঘৃণার মধ্যে বন্দি হয়ে যে কোনো বড় কাজ থেকে সে নিজেকে পিছিয়ে নেয়। নিজের পারঙ্গমতা বিচার করতে গিয়ে নিজের মধ্যে উঁকি দিয়ে সে কেবল শূন্য গহ্বরের মুখব্যাদান বা বিশৃঙ্খলার ঘূর্ণিপাক দেখতে পায়। কল্পিত আত্মজ্ঞানের শিখর থেকে আবার সে হুড়মুড়িয়ে পড়ে তিক্ত সন্দেহবাদের খাদে। নিজের সমস্ত সংগ্রামকে বেবাক অর্থহীন জ্ঞান করে সে ঘোষণা করে যে যত নীচু বা তুচ্ছই হোক না কেন যে

কোনও কাজ করতে সে রাজি যদি সে কাজ আসল ও দরকারী হয়। এখন সে অবিশ্রান্ত ব্যস্ততার মধ্যে মুখ গুঁজে সান্ত্বনা খোঁজে, এমন সে যে কোনো আড়াল খোঁজে যার পিছনে নিজের থেকে লুকিয়ে থাকা যায়। প্রকৃত শিক্ষার পথ দেখিয়ে দিতে পারে এমন কোনো পথপ্রদর্শকের সান্নিধ্যের অভাব এভাবে হতবুদ্ধি তরুণটিকে জীবনের একটা পথ থেকে আরেকটা পথে তাড়িয়ে নিয়ে বেড়ায়। সন্দেহ, ক্ষণেকের স্ফূর্তি, ক্ষণেকের ক্লেশ, আশা, নিরাশা নানা দিক থেকে তাকে ধাক্কা দিয়ে বেসামাল করে তোলে, মাথার উপর থেকে সবকটা ধ্রুবতারা মুছে যায়।

"শিক্ষা ও সংস্কৃতির গভীরতম চাহিদা সম্পন্ন সর্বোত্তম সত্তাদের ভাগ্যবিড়ম্বনার চোখে দেখলে বিখ্যাত এই স্বাধীনতা, বিদ্যায়তনিক স্বাধীনতার রূপটি এইরকম। এর সঙ্গে তুলনা করলে, স্থূলতর স্বল্পে-সন্তুষ্ট চরিত্ররা যেভাবে নিখাদ বর্বর অর্থে তাদের স্বাধীনতা উপভোগ করে তার কোনো মূল্য নেই। তাদের নিম্নমানের আমোদ আর অপরিপক্ক পেশাদারী সংকীর্ণতা নিয়ে তারা যে এই তথাকথিত স্বাধীনতার খোপে খাপে-খাপে এঁটে যায়, কে আর তা অস্বীকার করবে! কিন্তু তাদের সবার পরিতৃপ্তির সম্মিলিত ভারের চেয়ে অনেক ভারী এমন একটি তরুণেরও দুর্ভোগ যে সংস্কৃতির দিকে আকৃষ্ট হয়ে একজন পথপ্রদর্শক না পেয়ে শেষাবধি নিরুৎসাহিত হয়ে হাল ছেড়ে দেয় আর তখন থেকেই নিজেকে নিজে ঘৃণা করতে শুরু করে। সেই তরুণটি নির্দোষ। কারণ একদম একা দাঁড়িয়ে থাকার অসহ ভার কে তার উপর চাপিয়ে দিয়েছে? যে বয়সে একজন মহান পথপ্রদর্শকের কাছে নিজেকে নিবেদন করা, তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণ করা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও সবচেয়ে স্বাভাবিক আবশ্যকতা, সেই বয়সে কে তাকে স্বাধীন হওয়ার মন্ত্রণা দিয়েছে?

"এই মহান আবশ্যকতা যখন অক্লেশে পদদলিত হয়, তার ফল হয় মারাত্মক। বর্তমানের জঘন্য ছদ্ম-সংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষক ও বিপজ্জনক স্যাঙাৎদের দিকে একবার ভালো করে চেয়ে খুঁটিয়ে দেখলেই প্রায় ব্যতিক্রমহীনভাবে দেখা যাবে যে এরা সব এই অধঃপতিত বিপথগ্রস্ত শিক্ষার ভুক্তভোগী— যে সংস্কৃতিতে পৌঁছানোর পথ কেউ তাদের কোনোদিন দেখিয়ে দেয়নি, প্রতিক্রিয়াবশে ভিতরের চরম ক্রোধ ও নৈরাশ্যের তাড়নায় তারা এখন সেই সংস্কৃতির বিরুদ্ধে বিষোদ্গার করে যাচ্ছে। সাংবাদিক ও হালকা সাহিত্য রচয়িতারা কেউ পূর্ব থেকেই ওঁচা নীচস্বভাবের মানুষ নয়, নৈরাশ্যের মধ্য দিয়ে

রূপান্তরিত হয়ে আজ তারা এমন হয়েছে; সাহিত্যসভায় সাজগোজ করে টুঁ মেরে বেড়ানো অধমরাও আসলে ওই নিরাশাক্রান্ত ছাত্রছাত্রীদের অবতার।...

"...আমাদের শিক্ষিত পঠনপাঠনরত জনতার গোটাটাই যে এই অধঃপতনের চিহ্ন বহন করে চলেছে, তা বেশ ভয়ের বিষয়। আমাদের শিক্ষিতজনেরা অবিরাম সাংবাদিকদের লেখা পড়ে যায়, এমনকি মানুষকে দূষিত করার সাংবাদিকদের সহযোগিতা-সহায়তা করে যায়। এ বলা ছাড়া উপায় নেই যে তাদের বিদ্যা তেমন কাজেই আসে যেমনটা অপর কিছু জনের আসে উপন্যাস রচনার সময়: তা কাজে আসে নিজেদের থেকে পালানোর জন্য, বেপরোয়া আত্মধ্বংসের জন্য, শিক্ষা ও সংস্কৃতির জন্য নিজেদের চাহিদাকে গলা টিপে মেরে রিক্ত হওয়ার জন্য। আমাদের অধঃপতিত সাহিত্য এবং আমাদের পণ্ডিত কলমচিদের অর্থহীনভাবে ফাঁপানো বইগুলো থেকে একই দীর্ঘশ্বাস নির্গত হয়: কীভাবে আমরা আমাদের দৃষ্টি থেকে নিজেদের হারিয়ে ফেললাম?! সব প্রচেষ্টাই ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়: বেলচার পর বেলচা ভর্তি করে ছাপা পৃষ্ঠার পাহাড় গড়া হয়, কিন্তু তার ভারে স্মৃতিকে তো পিষে মারা যায় না, স্মৃতি মাঝেমধ্যেই ধুয়ো তোলে: 'ওহে অধঃপতিত সংস্কৃতির সন্তান! শিক্ষার গর্ভে জাত, আর অপশিক্ষায় লালিত, সহায়হীন হে বর্বর, তুমি বর্তমানের দাস, অপসৃয়মান মুহূর্তের শিকলে আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা, ক্ষুধাই তোমার নিয়তি— সর্বদা নিত্যক্ষুধা তোমার মধ্যে জ্বলছে!'

"এই নির্দোষদের দুর্গতির জন্য দায় কার? এরা যা পায়নি, যার অভাব এদের শেষতম জনটিকেও পীড়িত করেছে, তা হল এমন একটি প্রকৃত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান যা তাদের সামনে লক্ষ্য বেঁধে দিতে পারত; সুশিক্ষক, সুপ্রণালী, আদর্শ, সঙ্গী যোগাতে পারত; আর তার মধ্য থেকে প্রকৃত জার্মান চারিত্র্যের বলদায়ী উন্নতকারী শ্বাসপ্রশ্বাস সঞ্চালিত করে দিতে পারত। তার পরিবর্তে এই অভাগাজনরা বিজনপ্রদেশে ঘুরে মরছে; নিজেদের গভীর প্রবৃত্তি যে আত্মার অভিলাষী, সেই আত্মারই শত্রুতে অধঃপতিত হচ্ছে;অপরাধবোধের স্তূপ গড়ে তুলছে; প্রজন্মের পর প্রজন্ম আরো বেশি বেশি করে নির্মলকে কলঙ্কিত করছে, পবিত্রকে অপবিত্র করছে, মিথ্যা ও নকলকে পুজো করে সর্বোচ্চ আসনে বসাচ্ছে। তাদের মধ্য দিয়েই দেখা যায় আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর সংস্কৃতিকে চেহারা দেওয়ার ক্ষমতা কতটা।...

"বন্ধুরা, আমি আবার বলছি যে আজ সবাই 'বিদ্যায়তনিক স্বাধীনতা' বলে যার প্রশংসায় পঞ্চমুখ, সমস্ত শিক্ষার সূত্রপাত হয় ঠিক তার বিপরীত থেকে।

শিক্ষার শুরু হয় বাধ্যতা, অধীনতা, শৃঙ্খলা, দাসত্ব থেকে। মহান পথপ্রদর্শকদের যেমন অনুসরণকারী প্রয়োজন হয়, অনুসরণকারীরও তেমনই পথপ্রদর্শককে প্রয়োজন হয়। চারিত্র্যের ধাপবন্দি কাঠামোয় এক প্রকার পারস্পরিক পূর্বপ্রবণতা কাজ করে: হ্যাঁ, এক প্রকার পূর্বপ্রতিষ্ঠিত সমতানে তা বাঁধা। চিরায়ত যে ধাপবন্দি কাঠামোর দিকে সমস্ত বস্তু স্বাভাবিকভাবেই আকৃষ্ট হয়, সেই কাঠামোটিকেই উপড়ে ফেলে নস্যাৎ করে দিতে চাইছে বর্তমানে সিংহাসনে আসীন তথাকথিত সংস্কৃতি। এই তথাকথিত সংস্কৃতি পথপ্রদর্শকদের অবনমিত করে তার বাধ্যতামূলক দাসত্বের ধাপে বাঁধতে চায়, অথবা একেবারেই নিকেশ করে দিতে চায়; পথপ্রদর্শকের খোঁজে ফেরা পূর্বনির্ধারিত অনুসরণকারীদের বিপথে চালিত করে তা এমন নেশাসক্ত করে তোলে যে তাদের সেই খোঁজার প্রবৃত্তিও শুকিয়ে যায়। অবশ্য, পারস্পরিকতায় একে অপরের জন্য নির্দিষ্ট এই দুই পক্ষ যদি আহত যুদ্ধবিধ্বস্ত অবস্থাতেও অবশেষে পরস্পরের কাছে আসার পথ করে নিতে পারে, গভীর শিহরণ জাগানো এক সুখানুভূতি চিরায়ত বীণার তারের ঝঙ্কারের মতো প্রতিধ্বনিত হয়ে ওঠে।

"সেই অনুভূতি কেবলমাত্র এক উপমার মাধ্যমেই কিছুটা বর্ণনা সম্ভব। তোমরা কি কখনো গোষ্ঠীবাদন দলের অনুশীলনে গেছ? জার্মান অর্কেস্ট্রা মানবপ্রজাতির যেরূপ অদ্ভুত কুঞ্চিত সৎ-স্বভাব অনুগোষ্ঠী দিয়ে তৈরি তাদের ভালোভাবে দেখেছ? আকার রূপী খামখেয়ালী দেবীর এ যে কি অদ্ভুত খেয়াল! কীরূপ নাক-কান! কীরূপ কদাকার নড়নচড়ন আর কঙ্কালের ঠনঠনানি! মুহূর্তের জন্য কল্পনা কর যে তুমি বধির, সুর বা সঙ্গীতের অস্তিত্ব সম্পর্কে কখনো তুমি খোয়াব দেখনি, আর অর্কেস্ট্রার সঙ্গীতাংশগুলোকে কেবল নিখাদ শারীরিক নড়নচড়নের প্রদর্শনী হিসেবে তোমাকে উপভোগ করতে বলা হয়েছে। সঙ্গীতের আদর্শায়িত প্রভাব যেহেতু তোমার উপর কাজ করবে না, তোমার কাছে এই শারীরিক প্রদর্শনী কোনও মধ্যযুগীয় কাঠখোদাইয়ের মতো স্থূল ও হোমো স্যাপিয়েনস প্রজাতির এক নিষ্পাপ ব্যঙ্গচিত্র বলে মনে হবে।

"এবার কল্পনা কর যে তুমি তোমার শ্রবণশক্তি ফিরে পেয়েছ। তোমার কান খুলে গেছে। আর, বৃন্দবাদকদের সারির সামনে দাঁড়িয়ে একজন যোগ্য বাদন-পরিচালক তাঁর নির্দিষ্ট কাজটি করছেন। এখন আর কোনো ব্যঙ্গচিত্র বলে মনে হবে না। তুমি মন দিয়ে শুনবে। কিন্তু না, আমাদের সুযোগ্য বাদন-পরিচালকটি তাঁর সহবাদকদের কাছে কেবল একঘেয়েমির বোধই জ্ঞাপন করতে পারছেন বলে মনে হয়। তোমার চোখে পড়ছে কেবল শিথিল দুর্বলতা; কানে আসছে

কেবল ছন্দপতন, সুরের মাঝারিয়ানা আর আবেগের অকিঞ্চিৎকরতা। তোমার কাছে অর্কেস্ট্রাটি কেবলমাত্র একটি অল্পবিস্তর বিরক্তিকর জটলা বলে মনে হচ্ছে, যদি না তুমি যারপরনাই বিরক্তি বোধ করতে থাক।

"আর এবার তোমার কল্পনাকে ডানা মেলতে দাও। একজন জিনিয়াস, প্রকৃতই একজন জিনিয়াসকে ওই জটলার মধ্যে স্থাপন কর। মুহূর্তে এক অভাবনীয় বদল টের পাবে। যেনবা আত্মার কোনো জাদুকরী স্থানান্তরকরণের মধ্য দিয়ে মুহূর্ত মধ্যে সেই জিনিয়াস ওই অর্ধ-পাশব দেহগুলোর মধ্যে প্রবেশ করেছে আর তারা সবাই যেন অপার্থিব শক্তিধর দৃষ্টি মেলে একযোগে তাকিয়ে আছে। এখন দেখ। এখন শোনো। তোমার চোখ ও কানের তৃষ্ণা যেন আর মিটবে না! গরিমময় ঝঞ্ঝা বা হৃদয়-নিঙড়ানো বিলাপে এখন অর্কেস্ট্রা দুলছে, তার প্রতিটি সঙ্গীতাংশের ছন্দীয় অমোঘতা যেন চঞ্চল পেশীর টানের মতো অনুভূত হচ্ছে। আর তখন তুমিও উপলব্ধি করবে পথপ্রদর্শক ও অনুসরণকারীর মধ্যে পূর্বপ্রতিষ্ঠিত সমতান কী দিয়ে গঠিত, আর কীভাবে চারিত্র্যের ধাপবন্দি কাঠামোয় সবকিছু এই ধরনের সংগঠনের দিকে ধাবিত হয়। আমার এই উপমা থেকে তোমরা হয়ত অনুমান করতে পারবে যে প্রকৃত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বলতে আমি কী বুঝি এবং কেন কোনোভাবেই বিশ্ববিদ্যালয়কে আমি সেই স্থান দিতে পারি না।"

টীকা

১. ১৭৯০ সালে প্রকাশিত ইমানুয়েল কান্টের দি ক্রিটিক অফ জাজমেন্ট বইয়ের ‘ইনটেলিজিবল নেচার’ সংক্রান্ত ধারণাকে এখানে উল্লেখ করা হয়েছে।

2. উনিশ শতকের জার্মানিতে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে অস্তিত্বরক্ষার জন্য যে প্রশ্নের মুখোমুখি হতে হতো, তা হল: ‘রাষ্ট্রের জন্য সে কী কাজ করছে?’

৩. ‘জাতীয়-অর্থনৈতিক’ অর্থাৎ জার্মানে ‘ন্যাশনালওয়েকোনমি’ শব্দটি কার্ল মার্কস প্রবর্তন করেছিলেন অ্যাডাম স্মিথ, ডেভিড রিকার্ডো ও জে এস মিলের ধ্রুপদী উদার অর্থনৈতিক চিন্তাকে চিহ্নিত করতে। নিৎশে এখানে এই শব্দটিকে ব্যবহার করে অর্থনৈতিক উৎপাদনশীলতাকে যে কোনওকিছুর কার্যকারিতার মাপকাঠি করা সম্বন্ধে নিজের আপত্তি ও সমালোচনাকে জানান দিয়েছেন।

৪. ১৭৯৮ সালে ‘দি কনফ্লিক্ট অফ দি ফ্যাকালটিজ’ প্রবন্ধে ইমানুয়েল কান্ট লিখেছিলেন যে বিদ্যার্জনের গোটা প্রক্রিয়াটিকে এবং তাতে যুক্ত মগজগুলোকে শ্রমবিভাজনের মাধ্যমে ফ্যাকটরিতে অনুসৃত পদ্ধতি অনুযায়ী পরিচালনা করা মন্দ হয় না। কান্টের এই লেখার পর থেকে ১৮৭২-য়ে নিৎশের এই বক্তৃতার সময়ের মধ্যবর্তী পর্যায়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে বুদ্ধিবৃত্তিগত শ্রমবিভাজনের যুক্তিকে চরম বিন্দু অবধি ঠেলে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। সেটাই এখানে নিৎশের আক্রমণের লক্ষ্যবস্তু।

৫. বিদ্যাচর্চায় বুদ্ধিবৃত্তিগত শ্রমবিভাজনের পক্ষে যে যুক্তি দেওয়া হয় তা মূলগতভাবে এইরকম: একদিকে তথ্য ও প্রসঙ্গের অসীম বহুলতা, অন্যদিকে মানব জীবন ও সক্ষমতার সসীম ক্ষুদ্রত্ব— এই দুইয়ের তুলনা করলেই বোঝা যায় যে কোনও বিদ্যাচর্চাকারীই গোটা জ্ঞানের পরিসর তো দূরের কথা, তার একটা বাছাই করা উপখণ্ডেরও সমগ্র সম্বন্ধে সামগ্রিক ধারণা তৈরি করতে পারে না; সেই বিদ্যাচর্চাকারীর পক্ষে যা সম্ভব তা হল তাঁর চর্চার ক্ষেত্রটিকে ছোট করে এনে অনুসন্ধানের কাজটিকে সম্ভবের সীমার মধ্যে বাঁধা; এই কাজ করার মধ্য দিয়ে তিনি নিজে সমগ্রের উপলব্ধিতে পৌঁছন না, কিন্তু বিদ্যাচর্চাকারীদের যৌথসমাজের অংশ হিসেবে মানুষের জ্ঞানপ্রবাহের সমগ্রতার দিকে যাত্রার অংশ হিসেবে তাঁর আংশিক ভূমিকাটি পালন করেন। কিন্তু এই যুক্তিতে বিদ্যাচর্চার ক্ষেত্রকে বিশেষজ্ঞের কুঠুরিসমূহে ভাগ করে ফেলা কুঠুরিবাসিন্দাদের মধ্যে এমন যোগাযোগহীনতা ও অপরাপর সম্পর্কে উদাসীনতার জন্ম দিয়েছে যা কোনও যৌথসমাজের চরিত্র হতে পারে না।

৬. ‘বিজ্ঞান ও বিদ্যাচর্চার সেবায়...’— ইংরেজি অনুবাদের সঙ্গে প্রদত্ত টীকা থেকে জানা যায় যে এখানে মূল জার্মানিতে নিৎশে ‘বিজ্ঞান’ শব্দটির জায়গায় ‘উইসসেনস্যাফট’ শব্দটি ব্যবহার করেছিলেন। উইসসেনস্যাফট–য়ের প্রতিশব্দ বিজ্ঞান, তবে তা কেবলমাত্র পদার্থবিদ্যা, রসায়নের মতো প্রাকৃতিক বিজ্ঞানকে

বোঝায় না, তা যে কোনও প্রণালীবদ্ধ অনুসন্ধান, বিশ্লেষণ ও উপস্থাপনাকে বোঝায়, যেমন ইতিহাস ও চারুকলাতত্ত্বও তার মধ্যে পড়ে।

৭. সংবাদপত্রের জার্মান বলতে উনিশ শতকের শেষার্ধে সংবাদপত্রের লেখালেখিতে ব্যবহৃত ভাষারীতির মধ্য দিয়ে উদ্ভূত লিখিত জার্মানের ত্রুটিপূর্ণ রূপকে বোঝানো হয়েছে।

৮. নিৎশের সমকালীন জার্মানিতে প্রাথমিক বিদ্যালয়কে জিমনাসিয়াম বলা হতো। শিক্ষার্থীদের এখানে নয় বছর ধরে গ্রিক, লাতিন, ধর্মতত্ত্ব, পদার্থবিদ্যা, ইতিহাস, সাহিত্য, গণিত ও প্রাকৃতিক ইতিহাস বিষয়ে পাঠ নিতে হতো। নয় বছর শেষে 'আবিতুর' নামক একটি সামগ্রিক পরীক্ষার মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থীদের মূল্যায়ন করা হতো। উপরোক্ত বিষয়গুলো ছাড়াও শৃঙ্খলাপরায়নতা/আচরণ বিচার করে ছাত্রদের গ্রেড দেওয়া হতো। 'আবিতুর'-য়ে প্রাপ্ত গ্রেডের উপরই শিক্ষার্থীর বিশ্ববিদ্যালয়ে ঢোকার সুযোগ পাওয়া নির্ভর করত। নিৎশে এখানে জিমনাসিয়ামগুলোর যে উৎপত্তিকালীন পূর্বাবস্থার কথা বলছেন, তা আঠারো শতকের 'গেলেহরটেনস্কুল '-য়ের কথা যখন ধর্মতত্ত্ব ও লাতিনই ছিল শিক্ষাদানের মূল বিষয়।

৯. ইতিহাস ও ইতিহাসচর্চা প্রসঙ্গে নিৎশে তাঁর বক্তব্য বিশদে আলোচনা করেছেন 'আনটাইমলি মেডিটেশনস'-য়ের অন্তর্গত 'দি ইউজেস অ্যান্ড অ্যাবিউজেস অফ হিস্ট্রি' প্রবন্ধে। ধ্রুপদী ভাষাতত্ত্বের ইতিহাসবিদ্যক পণ্ডিতি জাহির করার সমালোচনা নিৎশে ওই প্রবন্ধে আরো বিস্তৃত করেছেন।

১০. জোহান ক্রিস্তোফ ফ্রিয়েদরিশ শিলার (১৭৫৯–১৮০৫) প্রসিদ্ধ জার্মান নাট্যকার ও কবি।

১১. বই লেখা ও প্রকাশনা নেহাতই একটি বাণিজ্যিক প্রকল্প হয়ে ওঠার প্রবণতা ইমানুয়েল কান্টের সময়েই পরিস্ফুট হয়ে উঠেছিল। কান্ট তাঁর সমসাময়িক বার্লিনের প্রকাশক ফ্রিয়েদরিশ নিকোলাই সম্পর্কে বলেছিলেন যে সে ফ্যাকটরির উৎপাদনের হারে বই উৎপাদন করে। নিৎশে সময়ে এসে এই বাণিজ্যিকীকরণ আরও গেঁড়ে বসেছিল, তাকেই নিৎশে 'বই উগরে চলা' বলেছেন।

১২. গ্রিক পুরাকথার একটি চরিত্র হেফায়েসটাস। গ্রিক দেবী হেরার সন্তান হেফায়েসটাস। জন্মকালে হেফায়েসটাস এতই দুর্বল ছিল যে হেরা বিরক্ত হয়ে তাকে অলিম্পাস পর্বতের চূড়া থেকে নীচে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিল। হেফায়েসটাস সমুদ্রে এসে পড়ায় কোনও অঙ্গহানি ছাড়াই বেঁচে গিয়েছিল এবং থিতিস ও ইউরিনোমের আশ্রয়ে জলতলের গুহায় বড় হয়ে উঠেছিল। সেখানেই সে তার প্রথম কামারশালা প্রতিষ্ঠা করে। ঘটনাচক্রে হেরা হেফায়েসটাসের ধাতুশিল্পে পারদর্শিতার কথা জানতে পেরে তাকে অলিম্পাসে ফিরিয়ে আনে এবং আফ্রোদিতির সঙ্গে তার বিবাহের আয়োজন করে। এরপর জিউসের বিরুদ্ধে

বিদ্রোহ করার অপরাধে হেরাকে যখন জিউস হাত বেঁধে ঝুলিয়ে রাখার শাস্তি দেয়, তখন হেফায়েসটাস তার নিন্দা করে। ক্রুদ্ধ জিউস হেফায়েসটাসকে ফের অলিম্পাসের শিখর থেকে ছুঁড়ে ফেলে দেয়। লেমনোস দ্বীপের উপর এসে পড়ে হেফায়েসটাস এবং তার দুটো পা ভেঙে যায়। মুমূর্ষু অবস্থায় দ্বীপবাসীরা তাকে উদ্ধার করে। হেফায়েসটাস প্রাণে বেঁচে যায়। হাঁটার জন্য সে সোনা দিয়ে দুটো অবলম্বন বানায়, যা নিয়ে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে সে হাঁটত। শেষাবধি জিউস তার অপরাধ মার্জনা করে তাকে অলিম্পাসে ফিরে আসার অনুমতি দিয়েছিল।

১৩. জ্ঞানচর্চার প্রাতিষ্ঠানিক স্বীকৃতি-প্রাপ্তি-মান অর্জনের ছকে বাঁধা পথের পথিক এবং প্রতিষ্ঠান-নিরপেক্ষভাবে বা কখনও প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে জ্ঞানচর্চার নিজস্ব পথ অনুসন্ধান ও নির্মাণ করে চলা পথিক— এই দুইয়ের পার্থক্যকে নিৎশে এখানে তুলে ধরছেন বলে মনে হয়।

১৪. বেরথোল্ড অয়েরবাখা (১৮১২–১৮৮২) বর্তমানে বিস্মৃত হলেও তাঁর সমসময়ে লেখক হিসেবে প্রসিদ্ধি লাভ করেছিলেন। তিনি ইহুদি ছিলেন। ইভান তুর্গেনেভ চার্লস ডিকেন্সের সঙ্গে তাঁর তুলনা করেছিলেন। তাঁর বসতস্থান নর্দস্তেতেন-য়ের কৃষকসমাজের জীবনের উপর ভিত্তি করে ১৮৪৩ সালে প্রকাশিত তাঁর 'ব্ল্যাক ফরেস্ট ভিলেজ স্টোরিজ' প্রচুর জনপ্রিয়তা ও প্রশংসা অর্জন করেছিল।

১৫. কার্ল এফ গুৎজকোও (১৮১১–১৮৭৮) ইয়ং জার্মানি আন্দোলনের মধ্য দিয়ে লোকনজরে এসেছিলেন। প্রুশিয়ান শাসনের দমনপীড়নমূলক দিকের বিরোধিতায় তিনি সোচ্চার হওয়ায় ১৮৩৫ সালে পার্লামেন্ট তাঁর সমস্ত লেখা নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছিল, ধর্মকে অসম্মান করার জন্য তাঁকে কারাদণ্ডও দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু ১৮৫০ পরবর্তী সময়ে তিনি বিপুল হারে লেখা প্রকাশ করতে থাকেন এবং তাঁর বৃহদাকার উপন্যাসগুলোয় সাংবাদিকতার চটজলদি ঘরানা ছাপ ফেলেছিল। নিৎশে যাকে এর আগে 'বই উগরে যাওয়া' বলেছেন, সেই দোষেই তাঁকে দোষী করেছেন।

১৬. **গ্যেটে**—জোহান উল্ফগ্যাঙ ভন গ্যেটে (১৭৪৯–১৮৩২) জার্মান কবি, নাট্যকার ও ঔপন্যাসিক, যাঁর বিখ্যাত নাট্যকাব্য 'ফাউস্ত' বিশ্বের শ্রেষ্ঠ ধ্রুপদী সাহিত্যকর্মের মধ্যে স্থান করে নিয়েছে। **শিলার**— টীকা ১০ দ্রষ্টব্য। **লেসিঙ**— গটহোল্ড ইফরায়িম লেসিঙ (১৭২৯–১৭৮১) ছিলেন জার্মান লেখক, দার্শনিক ও শিল্প-সমালোচক, আরিস্ততলের 'পোয়েটিকস'-য়ে বর্ণিত নাট্যতত্ত্বকে তিনি চিন্তার ভিত্তি হিসেবে হাজির করেছিলেন, তাঁর রচিত নাটক ও তাত্ত্বিক লেখা জার্মান সাহিত্যের বিকাশপথে নির্ধারক প্রভাব ফেলেছিল। **উইঙকেলমান**— জোহান জোয়াকিম উইঙকেলমান (১৭১৭–১৭৬৮) একজন পুরাতাত্ত্বিক ও চারুকলার ইতিহাসের আলোচক, তিনিই প্রথম গ্রিক গ্রেকো-রোমান ও রোমান চারুকলার মধ্যে

পার্থক্যীকরণ করেছিলেন, চারুকলায় হেলেনিয় ঘরানার অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন।

১৭. **গেরভিনাস**— গিয়র্গ গটফ্রায়েড গেরভিনাস (১৮০৫–১৮৭১) একজন ইতিহাসবিদ যিনি ১৮৩৫ থেকে ১৮৪২ সালের মধ্যে পাঁচ খণ্ডে লেখা জার্মান সাহিত্যের ইতিহাস রচনা করেছিলেন। **স্খমিড**— জুলিয়ান স্খমিড (১৮১৮–১৮৮৬) ছিলেন জিমনাসিয়ামের শিক্ষক, সাংবাদিক এবং জার্মান সাহিত্যের ইতিহাস বিষয়ক গ্রন্থপ্রণেতা।

১৮. প্রাচীন গ্রিসকে 'গভীরতম বাসনার ভূমি' হিসেবে দেখা জার্মান ধ্রুপদী সাহিত্যে বারবার ফিরে এসেছে, গ্যেটের লেখাতেও আমরা তা পাই।

১৯. ফ্রিয়েদরিশ স্পিয়েলহাগেন (১৮২৯–১৯১১) ছিলেন জার্মান বাস্তববাদী ঘরানার উপন্যাসের অন্যতম জনপ্রিয় রচয়িতা যিনি প্রাক-১৮৪৮ উদারপন্থী বিপ্লবের মতবাদের প্রতিনিধি ছিলেন।

২০. ১৮৫২ সালে প্রথম অভিনীত 'দি জার্নালিস্টস' কমেডিটি সেই সময়ে জনপ্রিয় হয়েছিল। গুস্তাভ ফ্রেতাগ (১৮১৬–১৮৯৫) ছিলেন এর রচয়িতা, যাঁর রচনা উঠতি মধ্যবিত্ত শ্রেণির কাছে বুর্জোয়া জীবনযাপনশৈলীর ব্যাখ্যান হিসেবে আগ্রহের বস্তু ছিল।

২১. হেরমান গ্রিম (১৮২৮–১৯০১) ১৮৭৩ সালে বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ের সদ্যপ্রতিষ্ঠিত চারুকলার ইতিহাসের অধ্যাপকপদে প্রথম অধ্যাপক হিসেবে নিযুক্ত হন।

২২. **ভেনাস ডি মিলো**— প্রাচীন গ্রিসের হেলেনিয় কালপর্যায়ে (আনুমানিক ১৫০ থেকে ১২৫ খৃস্টপূর্বাব্দের মধ্যে) অ্যান্টিওকের আলেকজান্দ্রস এই অনুপম পাথরের মূর্তিটি তৈরি করেছিলেন বলে মনে করা হয়। মিলো-র আফ্রোদিতি বা লিলো-র ভেনাস নামে খ্যাত এই মূর্তিটি প্রাচীন প্রেমের দেবীর মূর্তি বলে অনুমান করা হয়। **ওরেস্তেস ও ইফিজেনিয়া**—গ্রিক পুরাকথা অনুসারে ওরেস্তেস ও ইফিজেনিয়া পরস্পর ভাই ও বোন। তাদের বাবা হল রাজা আগামেমনন এবং মা রানি ক্লিটেমেনস্ট্রা। হেলেন অপহৃত হওয়ার পর গ্রিকরা যখন ট্রয়ের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করছে, তখন আগামেমনন গ্রিক সমরবাহিনীর নেতা নির্বাচিত হন। গ্রিক নৌবহর আউলিস-য়ে জড়ো হয় যুদ্ধযাত্রার জন্য। সেখানে আগামেমনন দেবী আর্টেমিস-য়ের পবিত্র কুঞ্জবনে নিষেধ না মেনে হরিণ শিকার করেন। ক্রুদ্ধ দেবী বাতাসের গতি স্থির করে দিয়ে গ্রিকদের সমরতরীর যাত্রা স্তব্ধ করে দেন। এই ফাঁড়া কাটাতে আগামেমনন কন্যা ইফিজেনিয়াকে বলি দিতে হবে বলে গ্রিক পুরোহিত নিদান দেন। আগামেমনন 'জাতির স্বার্থে' কন্যাকে বলি দিতে রাজি ছিলেন। রানি ক্লিটেমেনস্ট্রা তার বিরোধিতা করে কন্যাকে বাঁচানোর নানা চেষ্টা করেন। তাঁর সমস্ত চেষ্টা সত্ত্বেও ইফিজেনিয়াকে গ্রিক পুরোহিতরা বলি দেয়। তারপর গ্রিক নৌবহর বিনা বাধায় যুদ্ধযাত্রা করে। ট্রয় যুদ্ধ শেষে আগামেমনন যখন ফিরে আসেন, তখন রানি

ক্লিটেমেনসট্রা নতুন প্রেমিকের সঙ্গে বসবাস করছেন। রানি ক্লিটেমেনসট্রা তাঁর নতুন প্রেমিকের সাহায্য নিয়ে কন্যার প্রাণহানির প্রতিশোধস্বরূপ আগামেমননকে হত্যা করে। এরপর পুত্র ওরেস্তেস বাবা আগামেমননের হত্যার প্রতিশোধ নিতে মা ক্লিটেমেনসট্রাকে হত্যা করে এবং রাজপদে আসীন হয়। **ঈদিপাস**— গ্রিক পুরাকথা অনুযায়ী থিবস-য়ের রাজা ঈদিপাস অজান্তে তাঁর নিজের বাবাকে হত্যা করে নিজের মাকে পত্নীরূপে গ্রহণ করেন। এই সম্পর্কের কথা যখন প্রকাশিত হয়, তখন তাঁর মা/পত্নী আত্মহত্যা করেন, ঈদিপাস অবশ্য আমৃত্যু রাজা হিসেবে থেকে যান। **আন্তিগোনে**— ঈদিপাসের কন্যা হলেন আন্তিগোনে। ঈদিপাসের মৃত্যুর পর রাজসিংহাসন দখলের গৃহযুদ্ধে ঈদিপাসের দুই ছেলে ইটিওক্লেস ও পলিনেইসেস পরস্পরকে হত্যা করেন। নতুন রাজা হন ক্রিওন। ক্রিওনের আদেশে পলিনেইসেস-য়ের দেহ যথাযথভাবে কবর না দিয়ে ভাগাড়ে ফেলে রাখা হয় পশুপাখিদের ছিঁড়ে খাওয়ার জন্য। আন্তিগোনে তাঁর ভাইয়ের প্রতি ভালোবাসা থেকে রাজাজ্ঞা অমান্য করেন, পলিনেইসিস-য়ের দেহ ভাগাড় থেকে তুলে কবর দেন। রাজাজ্ঞা অমান্যের জন্য এরপর আন্তিগোনেকে বন্দি করে একটি গুহায় আটকে রাখা হয়। সেই গুহাতেই আন্তিগোনে গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যা করেন।

২৩. গ্রিক পুরাসভ্যতাকে দেখার ক্ষেত্রে তাঁর সমসাময়িক পণ্ডিতদের থেকে নিৎশের দৃষ্টিভঙ্গি ছিল আলাদা। পুরাইতিহাসবিদরা গ্রিক পুরাসভ্যতা বলতে একটি পবিত্র অখণ্ড সরলতার ছবি নির্মাণ করতেন। নিৎশে তাঁর 'দি বার্থ অফ এ ট্রাজেডি' রচনায় এই অখণ্ড সারল্য কল্পনাকে সমালোচনা করেছিলেন। নিৎশের মত ছিল যে পুরাইতিহাসকে তার সামগ্রিকতায় পুনর্নির্মাণ করা অসম্ভব, পুরাইতিহাসের দিকে তাকালে আমরা আমাদের এই আধুনিক কালের আদর্শবোধ, অভাববোধ ও আকাঙ্খার (বিশেষ করে, খণ্ডিত অস্তিত্বের যন্ত্রণাবোধ ও অখণ্ডিত সমগ্রতার জন্য আকাঙ্খা) প্রতিফলনই সেখানে দেখতে পাব, পুরাকালকে সে যেরকমটা ছিল তেমনভাবেই বোঝা বা হাজির করা সম্ভব নয়, আমরা কেবল কিছু টুকরো অবশেষ বা নিমেষের ঝলকের মধ্য দিয়ে তাকে অংশত দেখতে ও হাজির করতে পারি।

২৪. ফ্রিয়েদরিশ অগস্ট উল্ফ (১৭৫৯–১৮২৪) ছিলেন আঠারো শতকের শেষদিকের জার্মানির একজন ভাষা-গবেষক ও দার্শনিক যিনি শিক্ষাব্যবস্থার সংস্কারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন।

২৫. **বেটোফেন**— লুডউইগ ভন বেটোফেন (১৭৭০—১৮২৭) পশ্চিমী ধ্রুপদী সঙ্গীতের দিকপাল রূপে সর্বজনস্বীকৃত, তাঁর সৃষ্টির মধ্য দিয়ে শিল্পরূপ হিসেবে সিমফনি সর্বোচ্চ শিখর ছুঁয়েছিল। **মেয়েরবিয়ার**— গিয়াকোমো মেয়েরবিয়ার (১৭৯১–১৮৬৪) একজন জার্মান ইহুদি সঙ্গীতরচয়িতা যিনি তাঁর সৃষ্ট অপেরা সঙ্গীতের জন্য সমসাময়িক কালে জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিলেন।

২৬. নিৎশে এখানে জার্মান প্রোটেস্টান্ট পুনর্গঠন আন্দোলনের কথা বলছেন।

২৭. ১৮৭০–১৮৭১ সালের ফ্রাঙ্কো-প্রুশিয়ান যুদ্ধের কথা বলা হয়েছে।

২৮. 'জনশিক্ষা'— মূল জার্মানিতে নিৎশে এখানে 'ভোক্সবিলডুঙ' (volksbildung) শব্দ ব্যবহার করেছেন। আঠারো শতকের শেষভাগ থেকে 'ভোক্সবিলডুঙ' শব্দটি আলোকপ্রাপ্তি যুগের আদর্শের বিস্তারের সঙ্গে যুক্ত হয়ে শিক্ষিত মুষ্টিমেয় অভিজাতবর্গের বৃত্ত ভেঙে সর্বজনমধ্যে শিক্ষার প্রসার বোঝাতে ব্যবহৃত হতে থাকে। উনিশ শতক জুড়ে শব্দটি মূলত প্রথাগত শিক্ষার বাইরে থাকা সমাজের নিম্ন শ্রেণিদের জন্য বয়স্কশিক্ষার উদ্যোগ বা শিশুশিক্ষার উদ্যোগকে বোঝাত। নিৎশের ভাবনায় শব্দটির অর্থ অন্য চেহারা নিয়েছে। নিৎশের মতে, 'ভোক্সবিলডুঙ' প্রকৃত শিক্ষার সঙ্গে কোনোভাবেই যুক্ত নয়, তা আসলে বাধ্য নাগরিক ও প্রশিক্ষিত কর্মীদল গড়ে তোলা ও বজায় রাখার রাষ্ট্রীয় স্বার্থকে চরিতার্থ করার উদ্দেশ্যে চালানো একটি প্রক্রিয়া।

২৯. নিৎশের চিন্তায় 'জিনিয়াস' শব্দটি বিশেষ তাৎপর্য বহন করে। 'জিনিয়াস' বলতে নিৎশে এমন মানুষকে বুঝিয়েছেন যিনি তাঁর সমসময়ের রীতিনীতি-সংস্কৃতির সমালোচক ও লঙ্ঘনকারী হিসেবে তাঁর যাপন, কাজ ও বার্তার মধ্য দিয়ে বর্তমানতার (being) বন্ধন বা জাড্য ভেঙে পরিবর্তমানতা (becoming)-কে মুক্ত করে দেন। নিৎশের চোখে মানবেতিহাস হল পরিবর্তমানতার এক ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ সমুদ্র যার মাঝে জিনিয়াসরা অর্ধনিমজ্জিত পাহাড়ের মতো মাথা তুলে দাঁড়িয়ে থাকে। কোনও এক কালপর্যায়ে মানবপ্রজাতির সবচেয়ে উন্নত রূপ এই জিনিয়াসদের মধ্য দিয়েই প্রকাশিত হয়। কোনও সমাজের স্বাস্থ্য ও জীবনীশক্তি বোঝা যায় সেই সমাজ কীভাবে তার জিনিয়াসদের গ্রহণ করছে তা দিয়ে। প্লেটো-পূর্ববর্তী গ্রিক সমাজের দার্শনিকদের উপর নিৎশের প্রথম জীবনের কাজ থেকেশুরু করে শেষতম কাজ অবধি জিনিয়াস সম্পর্কিত ধারণার একটি প্রবাহ আমরা দেখতে পাব।

৩০. বিদ্যাচর্চার শাখা হিসেবে 'ফিলোলজি'-র জন্ম উনিশ শতকে হয়েছিল। বিভিন্ন জ্ঞানসম্ভারের ঐতিহাসিক আবির্ভাব প্রক্রিয়ার বিচার হল 'ফিলোলজি'-র বিষয়। ধর্ম, পুরাণকথা, বিজ্ঞান ইত্যাদির ইতিহাস নিয়ে অনুসন্ধান 'ফিলোলজিস্ট'-দের কাজ। 'ফিলোলজি'-র যে প্রথাগত ধারা উনিশ শতকে গড়ে উঠেছিল, সেখানে কোনো একটি প্রাচীন পাঠ্যবস্তুর পিছনে থাকা বিস্মৃত ঘটনাবলী পুনর্নির্মাণ করে পাঠ্যবস্তুটির 'আসল' মানে আবিষ্কার করাই ছিল আগ্রহের বিষয়, এবং এই কাজে ছড়ানো-ছিটানো প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনের টুকরোগুলোকে জুড়ে একটি যুক্তিসম্মত সমগ্র গড়ে তোলাই ছিল মান্য পদ্ধতি। নিৎশে 'ফিলোলজিস্ট' হিসেবেই প্রশিক্ষিত হয়েছিলেন এবং ১৮৬৯ সালে বাসেল বিশ্ববিদ্যালয়ে ধ্রুপদী 'ফিলোলজি'-র শিক্ষকের পদেই নিযুক্ত হন। কিন্তু ক্রমশ নিৎশে 'ফিলোলজি'-র এই প্রথাগত ধারার সমালোচক হয়ে ওঠেন। একটি পাঠ্যবস্তু যেভাবে সমাজ জুড়ে ক্ষমতাচর্চার

টানাপোড়েনের মধ্য দিয়ে উৎপাদিত ও পুনরুৎপাদিত হয়, অর্থলাভ করে, সামনে উঠে আসে বা তলিয়ে যায়, সেই প্রক্রিয়াকে অনুধাবন করার চেষ্টা না করে প্রচলিত যুক্তিবিদ্যার হাতিয়ার দিয়ে একটি অপরিবর্তনীয় 'পরিচয়' 'অর্থ' বা 'সত্য' নির্মাণ করার চর্চাকে 'দর্শনরহিত' বলে চিহ্নিত করে নিৎশে তার থেকে নিজেকে বিযুক্ত করেছিলেন।

৩১. কাব্যতত্ত্ব (পোয়েটিকস)-য়ে আরিস্ততল এই মন্তব্য করেছিলেন।

৩২. সোফোক্লিস (৪৯৫–৪০৫ খৃস্টপূর্বাব্দ) আথেনস-য়ের বিখ্যাত ট্রাজিক নাট্যকার। তাঁর কালজয়ী নাটকগুলোর মধ্যে *রাজা ঈদিপাস, কলোনাসে ঈদিপাস, আন্তিগোনে, ইলেকট্রা, আয়াক্স* উল্লেখযোগ্য।

৩৩. আরিস্তোফেনেস (৪৪৫–৩৮৫ খৃস্টপূর্বাব্দ) আথেনস-য়ের বিখ্যাত কমিক নাট্যকার। *লিসিসট্রাটা, দি ক্লাউডস, দি ফ্রগস* ইত্যাদি তাঁর রচিত নাটক।

৩৪. পাবলিয়াস কর্নেলিয়াস টাসিটাস (৫৬–১২০ খৃস্টাব্দ) রোমের বিখ্যাত রাজনীতিবিদ ও ইতিহাসকার। প্রথম শতকের উপান্তে টাসিটাস *জারমানিয়া* রচনা করেছিলেন, যা রোম সাম্রাজ্যের বাইরের জার্মান জনজাতিদের প্রথম ঐতিহাসিক-নৃতাত্ত্বিক বিবরণ হিসেবে গণ্য করা হয়।

৩৫. 'সাংস্কৃতিক রাষ্ট্র' (জার্মান ভাষায়: Kulturstaat) শব্দবন্ধটি উনিশ শতকের জার্মানিতে চালু হয়েছিল। প্রুশিয়ার সরকার তার রাষ্ট্রনির্মাণ প্রকল্পের মধ্যে রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষণায় শিক্ষা, বিজ্ঞানচর্চা ও চারুকলাচর্চার পরিকল্পিত উদ্যোগকে গুরুত্বপূর্ণ স্থান দিয়েছিল। রাষ্ট্রের চোখে সংস্কৃতি ছিল এমন একটি পরিসর যেখানে পৃষ্ঠপোষক হিসেবে থাকার মধ্য দিয়ে সে সম্মান ও প্রতিপত্তি অর্জন করতে পারে এবং তার মধ্য দিয়ে তার শাসনক্ষমতাকে সে আরো মসৃণভাবে প্রয়োগ করতে পারে। এর হাত ধরেই 'সাংস্কৃতিক রাষ্ট্র' কথাটি জন্ম নিয়েছিল। প্রুশিয়ার প্রথম সংস্কৃতি-মন্ত্রী কার্ল ফ্রেহের ভন আলতেনস্টেন (১৭৭০–১৮৪০ খৃস্টাব্দ) সাংস্কৃতিক রাষ্ট্রকে পুলিশ রাষ্ট্র ও সামাজিক রাষ্ট্রের সঙ্গে তুলনীয় একটি গুরুত্বপূর্ণ রূপ বলে দাবি করেছিলেন।

৩৬. জার্মান দার্শনিক ও অধ্যাপক হেগেল (১৭৭০–১৮৩১) রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানের ঘনিষ্ঠ ছিলেন। 'যা বাস্তব তা যৌক্তিক এবং যা যৌক্তিক তা-ই বাস্তব'— হেগেলের এই তাত্ত্বিক সূত্রায়ণ প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্রের যৌক্তিকতা নির্মাণের জন্য খুবই উপযোগী। নিৎশে এখানে এইদিকেই ইঙ্গিত করেছেন। হেগেলের দর্শনের সঙ্গে নিৎশের বিরোধিতা অবশ্য আরো অনেক গভীর ও সুদূরপ্রসারী। তার একটি মূল দিককে এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে। হেগেলের ধারণায় আত্মবিরোধ ও নেতিকরণ দিয়ে গঠিত হওয়ার ফলে সমস্ত জীবনই দ্বান্দ্বিক; তাই খাঁটি, দ্বন্দ্বহীন বা সদর্থক কোনও বর্তমানতা হতে পারে না। জীবন সম্পর্কে এই নেতিবাচক বা দ্বান্দ্বিক দৃষ্টিভঙ্গিকে বর্জন করে নিৎশে দাবি করেন যে জীবন এমন একটি সদর্থক সংগ্রাম

যেখানে বিভিন্ন বল একে অপরের সঙ্গে যোঝে, সেই বলগুলি একে অপরের থেকে পৃথক, অসম, কিন্তু একে অপরের সঙ্গে দ্বন্দ্বমূলক নয়। হেগেলের ভাবনায় যেখানে দ্বন্দ্বমূলক বল একে অপরকে নেতিকরণ করে বিলুপ্ত হওয়ার মধ্য দিয়ে একটি নতুন সংশ্লেষের জন্ম দেয়, নিৎশে সেখানে কোনও বলেরই নেতিকরণ বা বিলুপ্তি ছাড়া নির্দিষ্ট কোনো পরিণাম ছাড়া পৃথক পৃথক বলের চলমান সংগ্রামের মধ্য দিয়েই গতি ও জীবনীশক্তিকে কল্পনা করেন। এই বিষয়ে বিশদ পাঠের জন্য পাঠক গিল দেল্যুজের *নিৎশে অ্যান্ড ফিলজফি* (হুগ টমলিনসন দ্বারা ফরাসি থেকে ইংরেজিতে ভাষান্তরিত, ১৯৮৩, দি অ্যাথলোন প্রেস) দেখতে পারেন।

৩৭. পিথিয়া: প্রাচীন গ্রিসের ডেলফিতে অ্যাপোলো-র পীঠস্থান যেখানে পূজারিণীদের মুখ থেকে পূর্বাভাস ও উপদেশ পাওয়ার জন্য গ্রিকরা সমবেত হতো।

৩৮. রিয়ালস্কুলের উৎপত্তি হয়েছিল আঠারো শতকের মাঝামাঝি সময়ে জিমনাসিয়ামের সমান্তরাল বিকল্প হিসেবে। প্রথাগত লাতিন ভাষাশিক্ষা দেওয়ার পাশাপাশি এখানে প্রাকৃতিক বিজ্ঞান ও অর্থনীতির ব্যবহারিক প্রশিক্ষণ দেওয়া হতো। বার্লিনে ১৭৪৭ সালে প্রতিষ্ঠিত অর্থনীতি ও গণিতের রিয়ালস্কুলে এই ধরনের অন্যতম প্রথম বিদ্যালয়। উচ্চতর বার্গারস্কুলের উৎপত্তি উনিশ শতকের প্রুশিয়ায়। বার্গারস্কুলে কথাটির অর্থ 'নাগরিকদের বিদ্যালয়'। রিয়েলস্কুলের ধাঁচেই এখানে প্রথাগত ধ্রুপদী পাঠক্রমের বাইরে মূলত ব্যবহারিক বিদ্যার প্রশিক্ষণ দেওয়া হতো। শিক্ষার্থীদের জন্য ছয় বছরের পাঠক্রম নির্ধারিত ছিল।

৩৯. প্লেটো আনুমানিক ৩৭০ খৃস্টপূর্বাব্দে *ফেদ্রাস* রচনা করেছিলেন। এই বইয়ে লেখকের মুখপাত্র হলেন সক্রেটিস, তাঁর সঙ্গে সংলাপরত ফেদ্রাস। তাঁদের মধ্যে দুটি কথোপকথনের মধ্য দিয়ে প্রেমের প্রকৃতি বিষয়ে দার্শনিক বিচার করা হয়েছে।

৪০. 'দুগ্ধপোষ্য মেষশাবক' খ্রিস্টান নৈতিকতা ও ভাবাদর্শের অনুষঙ্গ বয়ে আনে যেহেতু খ্রিস্টান কল্পনায় মানুষকে মেষশাবক ও ঈশ্বরকে তার পালনকর্তা মেষপালক হিসেবে দেখাই দস্তুর। এই দুগ্ধপোষ্য মেষশাবকের বিপরীতে ফেদ্রাসের ঘোড়াকে স্থাপন করে ও ফেদ্রাসের ঘোড়াকে বেছে নেওয়ার মধ্য দিয়ে নিৎশে খ্রিস্টান মতাদর্শ সম্বন্ধে তাঁর সমালোচনা ও বিরোধিতাকে প্রকাশ করেছেন। নিৎশের মতে খ্রিস্টান মতাদর্শ পাপের গ্লানিবোধে মানুষকে আত্মঘৃণায় ভরে তুলে জীবনীশক্তিকে অসাড় করে দেয়। তার বিপরীতে নিৎশে এক ট্রাজিক মনোভাবের পক্ষে যা জীবনীশক্তিকে সদা উজ্জীবিত করতে পারে। নিৎশে অন্যত্র লিখেছেন: "দেখা যাবে যে সমস্যাটা হলো দুঃখকষ্টভোগ নিয়ে: তাকে আমরা খ্রিস্টান অর্থে দেখব না কি ট্রাজিক অর্থে দেখব। খ্রিস্টান অর্থে দেখলে দুঃখকষ্টভোগকে পবিত্র ভবিষ্য অস্তিত্ব অভিমুখে একটি পথ হিসেবে দেখতে হয়; আর ট্রাজিক অর্থে দেখলে এমনকি অতি বীভৎস পরিমাণ দুঃখকষ্টভোগকেও সঙ্গতিদান করার মতো যথেষ্ট পবিত্র হলো বর্তমানতাই। একজন ট্রাজিক মানুষ এমনকি কঠোরতম দুঃখকষ্টভোগকেও সদর্থক

ভাবে নেয়: তা করার জন্য যথেষ্ট পরিমাণে সে শক্ত, ঋদ্ধ এবং দেবত্বারোপে পারঙ্গম। অপরদিকে, একজন খ্রিস্টান মানুষ পৃথিবীতে সর্বোচ্চ সুখের নিয়তিকেও অস্বীকার করতে চায়: যে রূপ ধরেই জীবন তার সামনে দাঁড়াক না কেন, সে এতই দুর্বল, নিঃস্ব ও বঞ্চিত যে সে কেবলই ক্লেশ ভোগ করে। ক্রসের উপর দণ্ডিত ঈশ্বর জীবনের উপর একটি অভিশাপ, জীবন থেকে পরিত্রাণ চাওয়ার এক চিহ্নস্বরূপ। অপরদিকে টুকরো টুকরো করে কাটা ট্রাজিক ডাইয়োনিসিয়াস হলো জীবনের প্রতিশ্রুতি: সে নিত্য পুনর্জন্ম লাভ করবে এবং নিত্য ধ্বংসের মধ্য থেকে আবার ফিরে আসবে।" (দি উইল টু পাওয়ার, ওয়াল্টার কাউফমান এবং আর জে হলিঙদেল কর্তৃক জার্মানি থেকে ইংরেজিতে অনুদিত, ১৯৬৮, ভিনটেজ,পৃষ্ঠা: ৫৪২-৫৪৩, এখানে বাংলা অনুবাদ ইংরেজি থেকে বর্তমান অনুবাদকের করা।)

৪১. নিৎশে এখানে হেগেলিয় দার্শনিক চিন্তাব্যবস্থার কথা বলছেন।